শ্রীশ্রীনন্দদুলালায় নমঃ

সাধনতত্ত্ববিচার।

প্রথমকল্প।

সর্ব্বজন্ম-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥

শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীবামাচরণবসুবিরচিত।

বহরমপুর, কুঞ্জঘাটা।
গৌরাব্দ ৪২৬, বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

মূল্য ৷৷০ কাপড়ে বাঁধা ১৲
শ্রী৺সেবায় অর্পিত।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার অপূর্ব্ব কৃপাবৈভবে অসম্ভব

সম্ভাবিত হইল, মূক শ্রীভাগবত

কথামৃতালোচনায় কৃতার্থ

হইল, শ্রীল আচার্য্য

বংশাবতংস

পরমারাধ্য

মদীশ্বর

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কংসারিলাল ঠাকুর

মহোদয়ের

শ্রীচরণ কমলে এই ভক্তি

অর্ঘ্য অর্পিত

হইল।

সেবক শ্রীরামচরণ বসু দাস।

শ্রীশ্রীনন্দদুলালায় নমঃ।

নিবেদন।

"অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহ, নাকরিহ রোষে॥"
শ্রী৺নন্দদুলাল মোর হৃদয়ে বিলাস।
কি লাগি কি করে কিছু না বুঝি আভাস॥
কিবা গায়, কি বাজায় যন্ত্র নাহি জানে।
মন্দ হয় যন্ত্রের দোষে, ভাল, যন্ত্রীর গুণে॥

বোবা-যন্ত্র যে কখনও বাজে, তাহা এতদিন জানিতাম্ না, কিন্তু সুযন্ত্রীর হাতে পড়িয়া তাহাও দেখি একরূপ বাজিল। ভাল বাজিল কি মন্দ বাজিল, তাহা যাঁহারা বিচার করিবার, তাঁহারা করিবেন। কিছু ভাল হইয়া থাকিলে, তাহাতে যন্ত্রের কোন কৃতিত্ব নাই, তাহা সুযন্ত্রীর অপূর্ব্ব কৌশলে হইয়াছে, আর যাহা মন্দ হইয়াছে, তাহা ষোলআনা যন্ত্রের নিজের দোষ। এই পুস্তক "আমি লিখিয়াছি" ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা, আবার ইহা "শ্রীভগবানের প্রেরণা" ইহাও ঘোর ভক্তাভিমান। কোনটীই এক্ষেত্রে ঠিক নহে, সেই কৈফিয়ৎ দিবার জন্যই এই ভূমিকা।

পরের স্কন্ধে অপরাধ চাপাইয়া নিজের নির্দ্দোষিতাপ্রমাণের চেষ্টা খুব লোভনীয়, আমিও সেই পথ ধরিলাম। বৎসরাধিককাল অতীত হইল, শ্রীমান্ জলধর রায়চৌধুরী বিএ, ও শ্রীমান্ নকুলেশ্বর ঘোষের যোগে, শ্রীগৌরাঙ্গপত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত

যোগেন্দ্রমোহন ভক্তিবিনোদ, আমার "কমলাকান্তের দপ্তর" লণ্ডভণ্ড করিয়া কয়েকখান জীর্ণ পত্র লইয়া যান এবং "সাধনতত্ত্ববিচার" শীর্ষক দিয়া তাঁহার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। কতক অংশ প্রকাশিত হইবার পর ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য ভাগ্যকুলস্থ পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর, "রাঙ্গা পা দুখানি" প্রণেতা সোণামুখীর শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে এবং ফরিদপুরস্থ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রবিশ্বাস প্রমুখ ভক্ত সুহৃদ্গণ বারম্বার আদেশ করেন, ঠিক তৎসময়ে মদীশ্বর প্রভুপাদ ও এই পুস্তক প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ প্রেরণ করেন, কাজেই আর বিচারের স্থান রহিল না, ভক্ত ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।

ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক-স্থলে অনাবশ্যক রকম বেশী ফুটাইয়াছে; আমাদের সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা জন্মিয়াছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও শক্তি আসিয়াছে, কিন্তু অনর্থক অবিশ্বাসের ও শুষ্ক তর্কের মাত্রা খুব বাড়াইয়াছে। মহাভাগ্যে প্রাচীন বৈষ্ণববংশে জন্মিয়াও আমি কালস্রোতে ভাসিয়া অবিশ্বাস ও সন্দেহের রাজ্যে যাইয়া পড়িয়াছিলাম; কুতর্ককৈতব সহজ বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল (এখনও ছাড়ে নাই)। নিজজীবনের ও কতিপয় ইংরাজী শিক্ষিত ভজনশীল বন্ধুর জীবনে পরীক্ষিত অসুবিধাগুলি আলোচনা করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। বাঞ্ছাকল্পতরু গোস্বামিপ্রভুপাদগণ সাধকের কোন প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখেন নাই, সমস্ত দুরূহ বিষয় জলের মত করিয়া বুঝাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু এখনই পল্লবগ্রাহিত্বের কাল আসিয়াছে যে, সে সকল সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ বা প্রবৃত্তি নাই, আলোচনার অভাবে সে সমস্ত গ্রন্থ দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িতেছে। অনেকে তাই সহজ

ভাষায় বিবৃত এইরূপ সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তপুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে মনে করেন। এইপুস্তক প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, শ্রীচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত, ইহাতে নিজের সিদ্ধান্ত কিছুই নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই পুস্তক প্রণয়নকালে অপূর্ব্ব শুভ-সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাই দুরূহ দার্শনিকতত্ত্বগুলির শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়ীভূত হইতে পারিয়াছে। দার্শনিক জটিল প্রশ্নগুলির মীমাংসাপক্ষে পরমারাধ্য মদীশ্বর প্রভুপাদ ও ৺নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট অখিলভক্তিশাস্ত্রবিদ্ পূজনীয় ৺রাধিকানাথ গোস্বামী এবং ষড়্দর্শনাচার্য্য পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীরাধারমণের সেবাইৎ শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামী এবং ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারি সাংখ্যতীর্থ এবং ভজনানন্দী অন্য সুধী বৈষ্ণবমহাজনগণের যথেষ্ট অনুকম্পা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের সম্পাদক পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় B. A. এবং হাবড়া কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত M.A.,B.L. এই পুস্তক খানি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী করিবার পক্ষে নানাপ্রকার উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

ইংরাজীশিক্ষিতগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা কৃপা করিয়া প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমরসপূরিত দার্শনিকতত্ত্ব-সমন্বিত অত্যুদার ধর্ম্মটি একটুকু আলোচনা করিয়া দেখুন, অল্পেই ইহার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য বুঝিতে পারিবেন।

বাধ্য হইয়া বহরমপুরে ছাপাইতে হওয়ায় পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন ভাল হয় নাই। ভক্তকৃপা হইলে বারান্তরে সে ত্রুটি নিবারণের চেষ্টা করা যাইবে। শ্রদ্ধেয় সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ইহার অধিকাংশ

প্রুফ দেখিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উল্লিখিত মহানু-ভবগণের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশিষ্টে ভিক্ষা—এই পুস্তকের মূল্যের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, ইহা শ্রী৺সেবায় অর্পিত হইয়াছে, তবে অকিঞ্চনের ভিক্ষা কেবল পাঠক পাঠিকাগণের কৃপাশীর্ব্বাদ।

জালালপুর, টাকী।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬
শ্রাবণ।

ভক্তচরণরেণুপ্রার্থী
শ্রীবামাচরণবসুদাস।

সূচীপত্র।

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলম্ শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং স জীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সাধনতত্ত্ব-বিচার।

(ক) গুরুপাদাশ্রয়।

কৃপাসুধা সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তম্ শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

হরিদাস—(গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) প্রভো, বাস্তবিকই আপনি দয়ার নিধি, আমি চক্ষু হারাইয়াছিলাম, মোহতিমির আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আমাকে এতদিন এক অদ্ভুত মায়ারাজ্যে ঘুরাইতেছিল, আমি মায়া-পিশাচীর হাতে পড়িয়া মহানন্দে পৈশাচিক আমোদে মজিয়াছিলাম, সাধ করিয়া কাল সর্পকে কণ্ঠহার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলাম; ক্রমে ক্রমে মোহ-মদিরায় নেশা এমন জমিয়া গিয়াছিল যে নিজের রক্তমাংস ভক্ষণ করিয়াছি আর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছি। আমি আত্মহা, প্রভো, এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। যদি কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমার মায়ামুগ্ধ-চক্ষুকে উন্মীলিত করিলেন তবে তত্ত্বোপদেশামৃত দানে নিস্তেজ চক্ষুকে শক্তিশালী করুন। মোহান্ধকারে

থাকিতে থাকিতে আমার দৃষ্টিশক্তি নিস্তেজ ও বুদ্ধিবৃত্তি জড় হইয়া গিয়াছে। প্রেমরাজ্যের উজ্জ্বল-ভাস্কর আমার নিস্তেজ চক্ষুকে ঝলসিয়া দিতেছে, সময়ে সময়ে হতাশ আসিয়া আমার চিত্তকে অবসন্ন করিতেছে। প্রভু যদি কৃপা করিলেন তবে আমার হাতে ধরিয়া লউন, নচেৎ আমি বিনষ্ট হইব। বেশ বুঝিতেছি, মায়া পিশাচী আমাকে এখনও ছাড়ে নাই, কখন্ আবার তাহার হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হই, সেই ত্রাসে আমার হৃদয় আতঙ্কিত হইতেছে। প্রভো, দীন হরিদাসের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করুন। (এই বলিয়া হরিদাস গুরুপাদমূলে জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে গাহিলেন :—

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিঘ্ন বিপদ সম্পদ মাঝে
থেকো সদা হরি আমার নিকটে।
আমি অতি দীন ভক্তি জ্ঞানহীন
হাতে ধ'রে মোরে নিও সাথে সাথে॥
পাপ প্রলোভন ফাঁদ পেতে আছে
গ্রাসিবে আমারে একা পেলে।
তাই বলি তোমারে যেওনা অন্তরে
থেকো হে অন্তরে হরিদাসের॥
ভব ভয়ে শঙ্কিত তরঙ্গে কম্পিত
ত্রিতাপে লাঞ্ছিত আর্ত্তজনে।
ভব ভয় ভঞ্জন নিত্য নিরঞ্জন
সত্য সনাতন রক্ষ দীনে॥

গুরুদেব—বৎস হরিদাস, দেখিয়া সুখী হইলাম যে অল্পদিনের মধ্যে তোমাতে হরিনাম মহামন্ত্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছে; অসাধ্য অপসন্ন রোগীর চিকিৎসায় একমাত্র মহৌষধি এই তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ হরিনাম; ইহা অমোঘ ঔষধি, তবে রোগের মাত্রা বিবেচনায় কাহার বা সত্বর কাহার বা বিলম্বে ফললাভ হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি বলিতেছেন শুন:—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

শ্রীচরিতামৃত।

অন্যস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কথোপকথনে ঠাকুর হরিদাস বলিতেছেন কি শুন:—

নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
অব্যবহিত হৈল না ছাড়ে আপন স্বভাব॥
নামাভাস হইতে সর্ব্ব সংসারের ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

শ্রীচরিতামৃত

বৎস! তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। ব্যাকুলতাই সজীবতার লক্ষণ, মোহান্ধ জীবের আত্মদৃষ্টি না হইলে তাহার উদ্ধারের আশা কোথায়? ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তাহার ব্যাধির খবর না রাখে, তবে ঔষধের চেষ্টা হইবে কেন? বহুমূত্র রোগে অন্তঃসার শূন্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু মূর্খ জীব তাহার খবর না রাখিয়া তবুও বিষতুল্য মিঠাই খাইতেছে। এতদিন তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছ, এখন ক্রমে তাহা আলোচনা করিবার তোমার যোগ্যতা আসিবেক। ঈশ্বরতত্ত্ব অতি দুর্বোধ্য, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"। এই মহাবাক্যের দ্বারাই তাহা বুঝিতেছ, আমাদিগের ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, ভজনবিহীন জনের এ সমস্ত লইয়া নাড়া চাড়া করা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, তজ্জন্য এতদিন তুমি বারম্বার অনুরোধ করিলেও আমি উহাতে ক্ষান্ত ছিলাম। এক্ষণে তোমার আগ্রহাতিশয্য ও প্রভুপাদের আদেশে পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করাইল; জানিনা মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা।

যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া তখন গুরুদেব স্তোত্র পাঠ করিলেন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥
ভাঃ ১। ১। ১। ভাবার্থদীপিকায়াম্।

হে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে, তোমার লীলামৃত কোটী সমুদ্রগম্ভীর, আজ তাহার কণাস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত করাইলে, দেখিও যেন অপরাধ-ভাগী না হই।

বৎস, আমি শাস্ত্রাদি-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত নহি বা মহাভাগবত নহি ; নিতান্ত দীনহীন অকিঞ্চন প্রেমভিখারী মাত্র। সাধু-বৈষ্ণব পদরজঃ আমার সম্বল, আর শ্রীগৌরাঙ্গ নামমাত্র আমার ভরসা ; যাহা কিছু সাধু মহাজনের নিকট শুনিয়াছি বা যাহা মহাপ্রভু কৃপা করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহাই আমার পুঁজি, যদি কোনস্থল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা সাধুজনমতবিরুদ্ধ হয়, কৃপা করিয়া অসঙ্কোচে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া চক্ষুদান দিও। মহাপ্রভুর চরিতামৃত আস্বাদনে ভক্তগণেই অধিকারী, যখন ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, আইস আমরা তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট লেহনে প্রবৃত্ত হই।

হরিদাস—প্রভো, আমি এতদিন অবিদ্যার কুহকে পড়িয়াছিলাম, ষোড়শোপচারে তাহারই পূজা করিয়া আসিয়াছি। মায়া আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে যে, এখন জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়াও নানাপ্রকার ধাঁধা ও সন্দেহ আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, এমন কি মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীর উপর আস্থা দৃঢ় হইতেছে না। এ মোহতিমির হইতে আমার উদ্ধার অসম্ভব বোধ হইতেছে, প্রভো, আপনার শ্রীপদে শরণ লইলাম, শরণাগত দাসকে কৃপা করুন।

গুরুদেব—বৎস হরিদাস, অধীর হইও না, হতাশ হইবার কিছুই নাই, তোমার নৌকা উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছে সত্য, তোমার নিজ শক্তিতে আর নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছ না তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া এখন আঁকু বাঁকু করিলে হইবে না, সুদক্ষ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন-তরণীর কাণ্ডারী কর, দেখিবে সুচতুর কর্ণধারের সুকৌশলে নৌকাখানি তুঙ্গ তরঙ্গরাজির উপর দিয়া হেলিতে

ভুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইবে। বৎস আশাগন্ধ ত্যজ; শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া ক্রিয়াতৎপর হও। এটা বিশেষ স্মরণ রাখিও যে সর্ব্ব-কারণ-কারণ সর্ব্ব মঙ্গলালয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। তিনিও সর্ব্বদাই তোমাকে কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই আছেন। তোমাকে প্রকৃতই হাতে ধ'রে সাথে সাথে নিবার জন্য সাথে সাথে ফিরিতেছেন; কখন্ যে তোমার আত্মদৃষ্টি হইবে, কখন্ যে তুমি কাতরভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইবে আর ডাকিবে "হে প্রপন্নভয়ভঞ্জন, আমায় রক্ষা কর", তিনি তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তোমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভয়হস্ত নামিয়া তোমাকে মায়া-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া চিদানন্দধামে লইয়া যাইবে। ইহা বাজে কথা নয়, প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত অভয়বাণী :—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতম্ মম॥

হরিভক্তিবিলাস।

যে ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া একবার মাত্র বলে যে "আমি তোমার হইলাম, আমি সর্ব্বকালের জন্য তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকি ইহাই আমার ব্রত জানিবে"।

হরিদাস—(সোৎসাহে) আজ্ঞে প্রভো, একবার ডাকিলেই কি তবে হইবে?

গুরুদেব—অত উতলা হইওনা, ভাল করিয়া বুঝ, এইরূপ অন্যায় পল্লবগ্রাহিত্বে আজকাল সব নষ্ট হইতেছে। দিব্যমাত্র

আমরা যে কত বড় বড় কথা বলি তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু কোনটাই অন্তরে পৌঁছে না; সবই উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। আজকাল শাস্ত্রালোচনায় এত বাড়াবাড়ি হুড়াহুড়ি হইয়াছে যে, এমন দিন নাই যেদিন পথে ঘাটে রেলে বা ষ্টিমারে সেই বেচারিকে নিয়ে টানাটানি না হচ্ছে, অথচ দেখা যায় তাহার একটী বর্ণও কাহারও ভিতরে প্রবেশ করে না। এই বিপদই শক্ত বিপদ হ'য়েছে। হাঁ একবার ডাকিলেই হবে সেটা নিশ্চিত, নিশ্চিত কেন সুনিশ্চিত; যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ইহাই আমার ব্রত অর্থাৎ অবিচল পাকা নিয়ম, কিন্তু প্রপন্ন হ'য়ে ডাকা চাই। মুখে মুখে বেগার দিলে বা মনকে চোখঠার দিলে হইবে না। সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ চাই। যখন কথা উঠিল তখন এই শ্লোকটী ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক।

ব্রত—বলিবার উদ্দেশ্য যে উহা সনাতন, অলঙ্ঘনীয় পাকা নিয়ম, সুতরাং ইহার উপর নিশ্চিতভাবে সকলে দৃঢ় আস্থা করিতে পারেন।

সর্ব্বদা—এরূপ ডাকের কোনরূপ কালাকাল নাই। কেহ যেন মনে না করেন যে এতকাল যখন ভুলেও তাঁহাকে ডাকি নাই বরং নানাপ্রকার পাপকার্য্যই করিয়াছি, তখন আর এখন শেষ অবস্থায় ডাকিলে কি হইবে! এরূপ বিচারের কোন স্থান নাই। যে কোন সময়েই হউক ডাকিলেই হইল, তাঁহার করুণা চিরদিন সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে।

প্রপন্ন—[প্র + পদ + ক্ত] = প্রাপ্ত, শরণাগত।

প্রকৃষ্টভাবে শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইতে হইবে। অর্থাৎ নিজের হাতে গাঁটিতে কিছু না রাখিয়া সটান তাঁহার শ্রীচরণে পতিত

হইয়া সেই অভয় চরণে শরণ লইতে হইবে। ইহাকেই বলে আত্মসমর্পণ। তখন আর আমিত্বের কিছুই থাকিবে না, সমস্তই তাঁহার। কামনা চলিয়া যাইবে, সুখ দুঃখ বোধ থাকিবে না; তোমার জিনিষ, তুমি যেরূপে রাখিয়া সুখী হও, সেইরূপে রাখ, এই একমাত্র কথা। সাধকের এই ভাবই গোপীভাব। তুমি গৃহে রাখিয়া সুখী হও, আচ্ছা তাই রাখ; কুলে জলাঞ্জলি দিলে সুখী হও, তাই কর, আমি সাজসজ্জা, অলঙ্কার পরিলে সুখী হও, আচ্ছা তাই করিব, আবার বিবসনা করিয়া সুখ পাও, তাই কর; জিনিষ তোমার, ভালমন্দ তোমার, নিন্দা খ্যাতি সবই তোমার, আমাদের কি, আমাদের কেবল এককথা "যাহাতে তুমি সুখী হও, তাই কর।" এইখানে মহাভাগবত কবিরাজ গোস্বামী গোপীভাবের কিরূপ আভাস দিয়াছেন শুন:—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

শ্রীচরিতামৃত।

এখন বুঝ, গোপী হওয়া কেবল মুখের কথা নয়, কত সাজ সজ্জার দরকার দেখ।

(ক) লোকধর্ম্ম—লৌকিক ধর্ম্ম, যাহা সমাজের খাতিরে গৃহীকে করিতে হইবে।

(খ) বেদধর্ম্ম—বেদ পুরাণাদিতে উক্ত ধর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদি।

(গ) দেহধর্ম্ম—ভোগবাসনা, আহার নিদ্রাদি।

(ঘ) কর্ম্ম—সমস্ত কর্ম্মই সেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত।

(ঙ) লজ্জা—ইহার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক, যেহেতু স্ত্রীজাতির লজ্জাটী অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, গোপীরা তাহাও শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

(চ) ধৈর্য্য—যতক্ষণ পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ সাম্‌লাইয়াছিলেন, পরে তাঁরা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন।

(ছ) দেহসুখ—তাহা ত বহুপূর্ব্বেই গিয়াছে, কঙ্কর ও বালুকা-তপ্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইতেও কষ্ট হইত না।

(জ) আত্মসুখমর্ম্ম—যাহাদের 'আত্ম' সম্বন্ধ বোধ নাই তাহা-দের আবার আত্মসুখই বা কি? আর তাহার মমতা বা কোথায়?

(ঝ) আর্য্যপথ—বাস্তবিক ইহা কুলকামিনীর পক্ষে দুস্ত্যজ্য বটে। পতি গৃহেবাস, পতিসেবাই স্ত্রীজাতির আর্য্যপথ। ইহা কিছুতেই ত্যাগযোগ্য নহে; কিন্তু কৃষ্ণভজনের জন্য গোপীগণ তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। (পরকীয়াতত্ত্ব পরে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে গোপীদের ইহা দূষণীয় নহে।)

(ঞ) নিজ পরিজন—ভাই, বন্ধু, স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি আত্মজন।

(ট) স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎ‌র্সন—ইহা আরও সুন্দর, মুক্ত-বৈরাগ্যের ইহাই একটী সুন্দর চিত্র। প্রিয়তমের জন্য নিজ-সুখ ত্যাগ করিলে বেশী কি হইল, তাঁহার জন্য আবার যদি গঞ্জনাভোগ ও যন্ত্রণা সহ্য না করিলাম তবে প্রেমের পরিপক্কতা

হইবে কিসে? মোট কথা সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিতে যখন পারিবে তখনই "প্রপন্ন" হইবে। —তখনই গোপী হইতে পারিবে। এই প্রপন্নভাবের আবার তারতম্য আছে। প্রপন্ন ব্যক্তি অতি দীনহীন, একেবারে অভিমান বিবর্জ্জিত, তৃণাপেক্ষাও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় ধীর ও সহিষ্ণু, মারিলে কাটিলেও কথা নাই বরং আঘাতকারীর মঙ্গলকামনা করেন, যথালাভেই সন্তুষ্ট যেহেতু শরণাগতের নিজসুখ চেষ্টা নাই, অভাব-আকাঙ্ক্ষাও নাই, নিজে নিরভিমানী অথচ অন্যকে সম্মান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এইখানে লোকপাবন মহাপ্রভুর জগন্মঙ্গল উপদেশ-শ্লোকটী স্মরণ কর।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥

শ্রীচরিতামৃত।

এই শ্লোক-রাজ প্রায় সকল কণ্ঠেই বিরাজ করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই ইহার অনুশীলন করেন না। ভক্তপ্রবর কবিরাজ গোস্বামী নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে মাথার দিব্য দিয়া কি বলিতেছেন শুন:—

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

শ্রীচরিতামৃত।

মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া কবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, এই শ্লোকের নির্দ্দেশ মত কার্য্য কর, নিশ্চয়ই "শ্রীকৃষ্ণ-চরণ" পাইবে। কি করিতে হইবে? সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

কিরূপে?—তৃণ হ'তে নীচ হইয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন, তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেমন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া গেলে তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার ক'রে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥

শ্রীচরিতামৃত।

ইহার আর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, তবে কিরূপে সাধককে তৃণ ও তরু হইতে হইবে তাহাই আলোচনার বিষয়। পরে সে বিষয় ধরা যাইবে; এখন বুঝ, শুধু নাম করিলে হইবে না, "প্রণয়" হইয়া ডাকা চাই।

প্রণয়ের মধ্যে আবার আর্ত্তভাবও দেখা যায়; লোকশিক্ষার জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব নিজকৃত শ্লোকে এই ভাবটী কেমন ফুটাইয়াছেন দেখ:—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ ৩৫৩পৃঃ

মায়ার হাতে পড়িয়া সাধক যখন ঘোর সংসার-সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাইতেছেন, তখন হঠাৎ সচেতন হইয়া কিরূপ পাহিত্রাহি ডাকিতেছেন—

"হে নন্দদুলাল তোমার কিঙ্কর ঘোর ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, প্রভো! দয়া ক'রে উদ্ধার কর, আর তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের ধূলি ক'রে অনুদিন চরণাশ্রয়ে রাখিও, যেন চরণ ছাড়া ক'রো না", ইহাই শরণাগতের চিত্র।

বৎস! আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, সহজে আমাদের এইরূপ "প্রপন্নভাব" আইসে না; দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চিত্রটী মনে ক'রো—যে মুহূর্ত্তে দুরাত্মা দুঃশাসন কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রিয়সখা শ্যামসুন্দরের কথা মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার মনে ছিল যে, আমি মহেন্দ্র-তুল্য পঞ্চস্বামীর পত্নী, অবশ্যই তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিবেন, তিনি সাভিমানে স্বামীগণের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। স্বামীগণ অধোবদন, সুতরাং দ্রৌপদীর সে আশা ব্যর্থ হইল। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সভাস্থ ধর্ম্মবীরগণের দিকে আকুল নয়নে তাকাইতে লাগিলেন, দে'খলেন, তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রের ন্যায়

লাগিল। তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজন্য-বর্গের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ধর্ম্মের স্থান অধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে। তখন স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা নিবারণ জন্য যথাশক্তি নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন, অবশেষে তাহাও যখন বিধ্বস্ত হইল, তখন প্রপন্ন হইয়া যুক্তকরে সেই অগতির গতি শরণাগতবৎসল শ্রীহরিকে কাতর প্রাণে ডাকিলেন। যেম্‌নি ডাক্ অম্‌নি ফল। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপা নামিল। এখন বুঝিলে "প্রপন্ন" কাহাকে বলে এবং এক ডাকেই ফল হয় কি না।

হরিদাস—বুঝিলাম, কিন্তু সমস্তই সাধনসাপেক্ষ, এখন তাহার পন্থা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরুদেব—বৎস! মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, তাই আমাদের এ দশা। আমরা সকল জিনিষের একটা Pocket Edition চাই। আমরা Algebra made easy, Science made easy পাইতেছি, সাধন ভজনও made easy চাই। অন্তর্য্যামী সকল মঙ্গলালয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলির জীবের মতিগতি ও শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়াই আমাদের প্রার্থিত সাধন ভজনও made easy করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেও মন না উঠিলে আর উপায় কি?

সিদ্ধিলাভ মুখের কথাও নহে বা বাজারে কিন্‌তে গেলে না যে চট্ ক'রে মিল্‌বে, তবে যে মিলাতে চাহে সে মুখের কথাতেই পাইবে ও ঘরে বসিয়া বিনা মূল্যেই পাইবে।

প্রভু নিজে রায় রামানন্দকে বলিতেছেন, "সাধ্যবস্তু সাধন

বিনা কেহ নাহি পায়"। অনাদি কাল হইতে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ; মায়ার হস্তে পড়িয়া সংসারে নিত্যবদ্ধ; যেটা জীবের বাসভূমী, সেটাও মায়ারাজ্য; তাহার চতুর্দ্দিকস্থ Environments সমস্তই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ, পরিকর পরিজন সমাজ ইত্যাদি সকলেই একই গোত্রের, সুতরাং এই বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে জীবের উদ্ধার লাভ করা সহজ নহে। সীতাদেবীকে সমুদ্র পার করিয়া অতি দুর্গম অশোক কাননে আট্কাইয়াছে। চারিদিকে অতি ভীষণ রাক্ষসগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি চেটি-কারা তাঁহার সহচরী। মধ্যে মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের গরিমা লইয়া দশানন আসিয়া নানা ছলে তাঁহাকে বিমোহিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। কখন বা শাণিত খড়্গ লইয়া কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া শাসন গর্জ্জনও করিতেছে। লাঞ্ছিতা সীতাদেবী সেই ব্রহ্ম সনা-তন স্বামীচরণ হইতে স্খলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুক্ষণ শ্রীরাম চন্দ্রের সেই অতুল চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নীরবে সমস্ত উপ-দ্রব সহ্য করিতেছেন। আর আশাবদ্ধ হৃদয়ে তাকাইয়া আছেন, তিনি ইহা নিশ্চিত জানেন যে তাঁহার প্রভু কখনও নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি সময় হইলে অবশ্যই আসিয়া উদ্ধার করিবেন। এখন কেবল তিনি পাপ প্রলোভন, তর্জ্জন গর্জ্জন হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার ক্ষীণ বাহুতে বল না থাকিলেও তিনি জানেন, যে তারকব্রহ্ম রামনাম আশ্রয় করিয়া তিনি আছেন, তাহা সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্ববিজয়ী, তিনি ঐকান্তিকভাবে ঐ নামাশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে, ত্রিভুবন-বিজয়ী লঙ্কানাথও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। সংসারক্ষেত্রে পতিত জীবের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। যদি ঠিক সীতাদেবীর ন্যায়

জীবও ঐরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া অনন্তশরণ শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নাম আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহার আর ভাবনা কি, তাহার গতি তিনিই করিবেন।

হরিদাস—প্রভো! আমরা যে অবস্থায় পতিত, তাহাতে আত্মরক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি যে ঘোর তুফানে পতিত হইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

গুরুদেব—বৎস হরিদাস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর। একটা আশ্রয় ধরিতে পারিলে নৌকা আর তাটীতে টানিয়া লইতে পারিবে না। একজন কেহ সহায় না হইলে বাস্তবিক আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

হরিদাস—(সভয়ে) আজকাল অনেকেই গুরুবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর পিতা, পিতার নিকট যাব তা আবার মোক্তার ধরিব কি জন্য?

গুরুদেব—বাপুহে! আজ কাল্‌কার কথা আর তুলো না। আজকাল সকলেই চৌদ্দপোয়া, কেহই আর তেরপোয়া হ'তে চায় না। কেহ কাহাকেও বড় মানিতে চায় না। এই অবিনয়ের ভাবে দেশটা আরও উৎসন্নে গেল। স্বীকার করি অনেক গুরু-নামধারী প্রভুদের অত্যাচারে বিস্তর ধর্ম্মহানি হইতেছে, সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে; তাহার যথাযোগ্য সুব্যবস্থা কর। তাহা না করিয়া একেবারে গুরুবাদ উড়াইয়া দিতে চাও? যাহা হউক তাঁহাদের মূলেই ভুল। হিন্দুধর্ম্ম কোন মোক্তার মানে না। মোক্তার কেহ নহেন, গুরুও যিনি গোবিন্দও তিনি। ভক্ত তুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ,
নিষ্ঠা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ।

কবিরাজ গোস্বামী কি বলিতেছেন শুন :—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে কি বলিতেছেন শুন :—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরু॥

হে উদ্ধব আচার্য্যকে আমি বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ আচার্য্য ও আমি এক বস্তু ইহাই জানিবে, তিনি তোমার চক্ষে মানুষ প্রতীতি হইলেও তিনি আমারই স্বরূপ-প্রকাশ অর্থাৎ তিনিই সাক্ষাৎ আমি, এইরূপ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে নিষ্ঠাবান হইও।

কদাচ তিনি আমাদেরই একজন, এইরূপ মানববুদ্ধি করিয়া কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করিও না। যেহেতু তাঁহাতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং তিনি অপ্রাকৃত পুরুষজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনাদি করিবে।

উক্ত শ্লোকের মৌলিক যে অর্থ তাহা তোমাকে শুনাইলাম। এখন গোস্বামী প্রভুপাদেরা "মাং" শব্দ অর্থে "মদীয়ং শ্রেষ্ঠং" এইরূপ করিয়াছেন; মূলতঃ একই অর্থ। তবে ভজনের জন্য,

সাধকের হিতের জন্য, গোস্বামী প্রভুরা শেষোক্ত অর্থই সমীচীন দেখাইয়াছেন। মদীয়ং অর্থে আমারই নিজ জন, আবার তার উপরেও শ্রেষ্ঠং বলিয়া আরও অভিন্ন-স্বরূপত্ব বুঝাইয়াছেন। কি জন্য এরূপ অর্থ আবশ্যক এবং ইহার সামঞ্জস্য কিরূপ, কিঞ্চিৎ পরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ফলকথা সর্ব্বশাস্ত্র ও সকল ভাগবত মোহন্তাদি একবাক্যে কীর্ত্তন করিতেছেন যে গুরু সাক্ষাৎ শ্রীভগবান শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রকাশ। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে গুরু কোন অংশেই ভিন্ন নহেন।

হরিদাস—প্রভো, দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আমরা সরল বিশ্বাস হারাইয়াছি। মনুষ্যে দেবতা বুদ্ধি সহজে আসিতে চায় না ; উহা যেন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

গুরুদেব—বৎস, ঈশ্বর-বিমুখ স্থূলদর্শী সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তবিক শ্রীগুরুদেবে শ্রীভগবান বুদ্ধি সঞ্জাত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অসম্ভব বলিতে পার না। বিশেষতঃ কাষ্ঠ লোষ্ট্র পূজক হিন্দুর মুখে ঐরূপ কথা আদৌ শোভা পায় না। আমরা পাষাণ-প্রতিমার মধ্যে যখন চিন্ময় সত্য সনাতনকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তা বৈকুণ্ঠেশ্বরের পূজা করিয়া থাকি ; তখন শ্রীভগবানের অংশবিভূতি, সচ্চিদানন্দময়ের চিৎকণ, জীবাধারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা পরমগুরু নিত্যানন্দস্বরূপকে অনুভব করিব, ইহা আর বেশী বিচিত্র কি হইল ? তবে হিন্দুধর্ম্মের চরম অধোগতি হইয়াছে বলিয়া, হিন্দুর হৃদয়ে ঐরূপ অবিশ্বাসের চিন্তা স্থান পাইয়াছে। আমরা এখন কাঞ্চন হারাইয়া খালি-আঁচলে গিরা দিয়া বসিয়া আছি, শস্য ছাড়িয়া

খোলা লইয়া গরবে চক্ষু লাল করিয়া রহিয়াছি। এখন শ্রীবিগ্রহ হইতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অন্তর্ধান করিয়াছেন, পাষাণ প্রতিমা পড়িয়া আছে ; আমরা সেই পাষাণের পূজা করিয়া আরও জড়ত্ব সঞ্চয় করিতেছি, প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, এখন হিন্দুধর্ম্মের কৃমিকীট-পূর্ণ স্থূল দেহটা পড়িয়া আছে, আর তাই লইয়া আমরা পৈশাচিক তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছি। "বলিহারি মায়া, তোমার মহীয়সী দৈবশক্তির নিকট সমস্তই বিধ্বস্ত ও নির্জ্জিত। স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিলসিত প্রেমভক্তি-রসাপ্লুত-পুণ্যভূমিকে এত অল্প দিন মধ্যেই তুমি একেবারে পিশাচের লীলাক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছ, তোমায় নমস্কার করি!" এই বলিয়া গুরুদেব সক্ষোভে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। হরিদাস ভীত অপরাধীর ন্যায় যুক্তকরে হতাশ নয়নে শ্রীপাদ মূলে উপবিষ্ট রহিলেন। কিছু কাল পরে অনুরাগরঞ্জিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"বৎস হরিদাস, স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্, আমরা আমাদের স্বরোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতেছি। আমাদের এই দশা অবশ্যম্ভাবী ; স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-স্বরূপের পদাশ্রয় পাইয়াও আমরা অবহেলায় তাহা হারাইয়াছি, তাই এই দুর্দ্দশা। ভগবদ্বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে॥

হে অর্জ্জুন, গুণময়ী আমার মায়া বড় সহজ নহেন, ইনি দৈব-শক্তিসম্পন্না, ইহাকে অতিক্রম করা অতি দুষ্কর (কিন্তু অসম্ভব

নহে)। এই দুরতিক্রম্য মায়ার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহার একমাত্র পন্থা আমার চরণাশ্রয় করিয়া থাকা। যে সমুদায় ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া আমাকে ধরিয়াছে কেবল তাহারাই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। বৎস! পরম কারুণিক শ্রীনন্দদুলাল তাই শ্রীনবদ্বীপ লীলায় আমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেন, আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, তাই প্রাপ্তবস্তু অবহেলায় খোয়াইলাম। স্যমন্তক মণি ভাগ্যে মিলিলে কি হইবে, উহা রাখিতে পারিলাম কই? তবে বৎস হতাশ হইও না, মহাপ্রভুর ধর্ম্মরাজ্য কখনও পিশাচের অধিকারভুক্ত থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি হইতেছে, ভক্তের কাতর ক্রন্দন প্রভুচরণে পৌঁছিতেছে, প্রভুর আসনও টলিয়াছে, উষার উন্মেষ দেখা যাইতেছে, অচিরেই আবার পূর্ব্ব শৈলে প্রেমসূর্য্য উদিত হইবে।

হরিদাস—(সাক্ষেপে) প্রভো, সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে মহাপ্রভুর অত্যুজ্জ্বল প্রেমরসপূরিত সত্যধর্ম্ম এতাদৃশী গ্লানিযুক্ত হইল কি জন্য?

গুরুদেব—বৎস, যে সন্দেশে বেশী ছানা ও ননী থাকে তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, আর যাহা চিনির ঢলা তাহা অনেক দিনেও নষ্ট হয় না। দয়াবান্ মহাপ্রভু নিগূঢ় ব্রজরস ছানিয়া দেবগণের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ব্রজগোপীর নিজস্ব বস্তু, গোলক বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব প্রেমরস-নির্য্যাস আনিয়া, অযাচিতভাবে নির্ব্বিচারে কলির জীবকে ঢালিয়া দিলেন, যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা মহানন্দে সেই চিন্তামণি-সার দুর্লভ রাধাপ্রেম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। পরবর্ত্তি জীবেরা স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও পার্ষদ ভক্ত-

গুণের সান্নিধ্য হারাইয়া ক্রমে শক্তিশূন্য ও বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িল, ক্রমে দেবত্ব যাইয়া জীবত্ব ও পশুত্ব জাগিয়া উঠিল। অসুরের আবির্ভাবে স্বর্গের অমৃত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, তবে পীঠস্থানে যাহা কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, কালক্রমে উহা হইতে আবার রসতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া ত্রিজগৎ ভাসাইয়া দিবে। ইহা কল্পনা নহে, ধ্রুব সত্য। প্রেমের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বৎস, ধর্ম্ম কখনও পতিত বা দুষ্ট হয় না। ধর্ম্ম চিন্ময় সনাতন, কতকগুলি উপধর্ম্ম ও কদাচার আসিয়া ধর্ম্ম সমাজকে কলুষিত করে মাত্র। কর্দ্দম জড়িত হইলে স্বর্ণ তাহার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য পরিহার করে না; মলিনত্ব অপসারিত হইলে সেই অতুলনীয় জাম্বুনদহেম আবার জগজ্জনকে প্রেমকান্তি বিতরণ করিবে।

হরিদাস—আমরা অতি মন্দ ভাগ্য, তাই এই পতিত সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছি; কুশিক্ষা আমাদের চিত্তকে সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী করিয়াছে।

গুরুদেব—অবস্থা বুঝিয়াছি; তবে তর্কপ্রবণতা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ কর। শাস্ত্র শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমোঘ সত্য ও যুগযুগান্তরীয় মুনিঋষিগণের কঠোর-সাধনালব্ধ উজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার। হিন্দুমাত্রকেই এখানে অবনত মস্তক হইতে হইবে। হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত, অনন্ত শাস্ত্রই একবাক্যে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে এবং সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য উপদেশ দিতেছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। তবে তোমার সন্দেহ অপনোদনার্থে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য কয়েকটী মহাবাক্য শুনাইতেছি।

মহাযোগীন্দ্র শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

বহুনোক্তেন কিং দেবী গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
নির্গুণঞ্চ পরংব্রহ্ম গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥

হে পার্ব্বতী, বেশী আর কি বলিব "গুরু" এই দুইটী অক্ষর দ্বারা নির্গুণ পরব্রহ্মকেই বুঝিবে, ইহার অত্যন্ত রহস্যজনক তত্ত্ব, যত্ন করিয়া গোপনে রাখিও।

মন্ত্ররাজমিদং দেবী গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং ;—
শ্রুতি বেদান্ত বাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদং ॥

হে দেবি, "গুরু" এই বর্ণদ্বয় সকল মন্ত্রের রাজা। শ্রীগুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া বেদবেদান্তে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

স্বতঃপ্রমাণ অনাদি বেদেও ঐ কথা শুনিতে পাই—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি"

শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই পরম পুরুষকে জানিতে পারেন।

"আচার্য্য দেবো ভবেৎ"

আচার্য্য মানুষ নহেন তিনি দেবতা।

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মাকে চতুশ্লোকীতে মূলতত্ত্ব উপদেশ দিবার ছলে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

এই সমস্ত অতি দুর্ব্বোধ জটিল বিষয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রশ্ন করিবে, তিনি সমস্ত নিষ্কাশন করিয়া দিবেন।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদ্গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতং ॥

যিনি সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, যিনি আত্মপরভেদশূন্য, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, যিনি শাশ্বত, যিনি পূর্ণ, যিনি প্রাকৃত দেহ-শূন্য, গুণাতীত পরমপুরুষ, সেই পরমাত্মারূপী শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

বৎস হরিদাস, বেশী বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন; গুরু বলিতে মনুষ্য বুঝিতে হইবে না, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ জগদ্গুরু বুঝিবে। সমগ্র শাস্ত্র পঞ্চমুখ হইয়া সেই শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

গুরু পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতি।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা, গুরুই অগতির গতি, শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে সমর্থ কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারে না।

এত গেল শাস্ত্রবাক্য, এখন সাধু-মোহান্তগণের উক্তি শ্রবণ কর।

বৈষ্ণব সাধকগণের ধ্রুবতারা বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

"শ্রীগুরু চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন॥"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ইষ্টদেব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বাগ্রে গুরুবন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

"যদ্যপি আমার প্রভু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারই প্রকাশ॥"

শ্রীবলদেবতত্ত্ব শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার ইষ্টদেব, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীঅনন্তরূপী শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দাদা হইলেও মহাপ্রভুর দাসাভিমান করেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, জগৎ আমার প্রভুকে যাহাই বুঝুক, কিন্তু তিনি আমার নিকট শ্রীনন্দনন্দনের প্রকাশমূর্ত্তি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সহিত অভেদ, যেহেতু তিনি আমার ইষ্টদেব।

হরিদাস—প্রভো, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও সাধু-মহাজনগণের উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। জীবমাত্রেই যখন ঈশ্বরের অংশবিভূতি তখন শ্রীগুরুদেবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সম্মান করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

গুরুদেব—কেবল শ্রীভগবানের অংশবিভূতি বুঝিলে চলিবে না, আরও বুঝিতে হইবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, উহা না করিলে জীবকে অধঃপতিত হইতে হয়। তুমি পিতামাতা হইতে এই মানবদেহ পাইয়াছ, মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? পরানন্দ প্রাপ্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ। সাধন ভজন দ্বারা তাহা লভ্য হয়। সুকৃতিবলে তুমি এখন সেই দুর্লভ মানবজনম পাইয়াছ, কৃষ্ণলীলা গানে কৃতার্থ হইতেছ, এই প্রেমানন্দলাভের মূলাধার কে ভাবিয়া দেখ, সেই ভূদেব পিতামাতাকে পূজা না করিলে কি তুমি ঘোর অকৃতজ্ঞতা দোষে দুষ্ট হইবে না? শাস্ত্রও তাই বলিতেছেন :—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

মাতা মুক্তিঃ মাতা ভক্তিঃ মাতাহি পরমাগতি।
মাতরি প্রীতিমাপন্নেঃ প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

কিন্তু মানব জনম পাইলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না, তবে তাহা পাইবার একটী সুযোগ পাওয়া যায় মাত্র। আমরা সহজেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, পাপ পথেই আমাদের সাহজিক গতি, সংসারের যাঁহারা আত্মীয় স্বজন তাঁহারা আরও ঐ দিকেই টানিতেছেন, তাই মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন জীবের যেমন চৈতন্যের উন্মেষ হয়, অমনি চক্ষু খুলিয়া নিজের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে আর শ্রীরাধাগোবিন্দের শরণ লইয়া বলে :—

সংসার সাগরাৎ নাথৌ পুত্রমিত্রগেহকুলাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্ন ভয় ভঞ্জনৌ॥

হে রাধাগোবিন্দ, হে প্রপন্নভয়ভঞ্জন, হে অনাথের নাথ, সংসারসাগর হইতে এবং পার্থিব পুত্রমিত্র বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কুলশীল হইতে আমাকে রক্ষা কর।

বুঝিতেছ আমাদের অবস্থা কি ভীষণ, পাপ প্রলোভন আমাদের গ্রাস করিবার জন্ত মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমাদের কর্ণধারবিহীন পাপভারাক্রান্ত জীর্ণ-জীবনতরণী আরও ভারি হইয়া ক্রমে পাপের পাকের দিকে ছুটিয়াছে; এহেন বিপন্ন অবস্থায় যে মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে মাভৈঃ ধ্বনি করিয়া আমাদের দুর্ব্বল হস্ত ধরিয়া সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে সাথে সাথে লইয়া

যাইতেছেন, যিনি কর্ণধার হইয়া ডুবুডুবু জীর্ণ তরীকে অঙ্গুলি-কৌশলে রক্ষা করিয়া ভবজলধি পারে লইতেছেন তাঁহাকে দেবতা বলিব না ত আর কাহাকে বলিব? যদি অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া থাকে, তবে প্রতি মুহূর্ত্তেই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহাকেই ভবভয়হারী-শ্রীকংসারি বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিতে বাধ্য; ইহা অতি স্বাভাবিক, অতএব সাধু শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় কর; ভক্তবৎসল অন্তর্যামী স্বপ্রকাশ শ্রীহরি আপনিই সব তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। ভাষার দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের বিষয় সম্যক্ বুঝান যায় না, কেবল আভাস পাওয়া যায় মাত্র। কুতর্কনিষ্ঠা ছাড়িয়া মহাজন-প্রদর্শিত পন্থার অনুগমন করিয়া দেখা আবশ্যক।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

না পড় কুতর্ক গর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে ডুবিলে হয় সর্ব্বনাশ।
সাধু গুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

হরিদাস—তবে তর্ক করিয়া সংশয় দূর করিয়া বুঝা শাস্ত্রের কি অভিপ্রায় নহে?

গুরুদেব—তাহা নহে, বৃথা কুতর্ক করিতে নিষেধ আছে। আমাদের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি, গুরুর নিকট সরলভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া বিচার করিয়া রহস্য বুঝিয়া লইবে, অন্ধ বিশ্বাস করিতে কেহ বলেন না।

সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত সাধু শাস্ত্র মত যক্ত
যুগল চরণে কর রতি॥

হরিদাস—বুঝিলাম, শ্রীভগবানই শ্রীগুরুদেবে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবকে উদ্ধার করিতেছেন।

গুরুদেব—ঠিক বলিয়াছ, মানুষ কখনও মানুষের উদ্ধারকর্ত্তা হইতে পারে না। অন্ধ অন্ধের চালক কিরূপে হইবে? তাই খ্রীষ্টানদের (Savior Jesus Christ) উদ্ধারকর্ত্তা যীশু ঈশ্বরের পুত্র, মুসলমানদের শ্রীমহম্মদ খোদার দোস্ত, আর আমাদের জগদ্‌-গুরু লোকপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

মানুষের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্ব আছে, পশুত্বকে বিনষ্ট করিয়া দেবত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই সাধনা; শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত অপৌরুষেয় শ্রীবীজমন্ত্র ঐ পশুত্ব বিনাশের ব্রহ্মাস্ত্র এবং দেবত্বাকর্ষণের অদ্ভুদ উদ্বোধনী শক্তি। তান্ত্রিক সাধকেরা এই বীজমন্ত্র দ্বারা সুষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই অদ্ভুত বীর্য্যশালিনী মন্ত্র-শক্তি শ্রীভগবানের নিজস্ব বস্তু; তাঁহা হইতে ক্রমে জগজ্জন প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়ার হাতে পড়িয়া জীব কালক্রমে নিজের শক্তি হারাইয়াছে; তাই এই অমোঘ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার অভাবে মলিন হইয়া আছে, তবে উহার অন্তর্নিহিত বীর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। উহা রাজাধিরাজ বিশ্বেশ্বরের শ্রীকর-স্থিত রাজদণ্ড। উহার অলৌকিক প্রভা দর্শনে দস্যু তস্কর

সুকলেই নির্জ্জিত ও অবসন্ন। এই রাজদণ্ডটী বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বা স্বকীয় স্বরূপ ভিন্ন অন্ত কাহারও হস্তে দেন না। তাই শাস্ত্র শ্রীগুরুকে শিবঃ শিবস্বরূপকঃ বলিয়াছেন, এবং 'মাং' অর্থেও মদীয়ং শ্রেষ্ঠং হইয়াছে।

যঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দঃ শিবঃ শিবস্বরূপকঃ।
মন্ত্রজ্ঞান প্রদাতা চ তং নমামি গুরুং বিভুং॥

যিনি দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করেন, যিনি পাপনাশন কৃষ্ণপ্রেমোদ্দীপক মন্ত্রশক্তি প্রদান করেন, যিনি মঙ্গলময় বিভু কংসনিসূদন পরমানন্দ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ তাঁহাকে প্রণাম করি।

এই বীজমন্ত্র মধ্যেও চৈতন্যস্বরূপ নিহিত আছেন।

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ।

অতএব যে মহাপুরুষ ঐ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন মন্ত্ররাজ প্রদান করিয়া আমাকে দৈবীশক্তিসম্পন্ন করিলেন, তাঁহাকে আমি দেবতা ভিন্ন আর কি বুঝিব?

"গুরু" এই শব্দ হইতেও পরব্রহ্ম অর্থ বুঝা যায়:—

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ॥

"গুরু" গ উ র উ এই চারিটী বর্ণ আছে। গকার সিদ্ধিপ্রদ, র পাপনাশন, উ শিবস্বরূপ। সুতরাং গুরু সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময়, পাপরূপ কংস ধ্বংসকারী শ্রীহরি ভিন্ন আর কি বলিবে?

হরিদাস—(সানন্দে) বুঝিলাম শ্রীগুরুদেব স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

গুরুদেব—ঐরূপ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবকে অন্তর্ব্বাহে পূজা অর্চ্চনা করিতে করিতে ভক্তির উদ্গম হইবে; তখন আর দ্বিধা থাকিবে না এবং নিষ্ঠা জন্মিবে। শাস্ত্রের অনুশাসনও ঐরূপ।

নরবুদ্ধিং বর্ণবুদ্ধিং গুরৌ চ গুরুমন্ত্রকে।
কদাচিন্নৈব কুর্ব্বীত কৃতে তু নরকং ব্রজেৎ॥

শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি এবং গুরুমন্ত্রকেও অক্ষরবুদ্ধি করিতে না করিলে নরকস্থ হইতে হইবে।

হরিদাস—প্রভো ক্ষমা করিবেন, লৌকিক জগতে কোন কোন গুরুব্যবসায়ী প্রভুদিগকে জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত দেখিলে তখন ঈশ্বরবুদ্ধি ছুটিয়া যায়, ইহাই মহামুস্কিল।

গুরুদেব—কথাটী ঠিক বলিয়াছ, উহা আমাদের স্বকৃত-ব্যাধি; শাস্ত্রের নির্দ্দেশ না মানিয়া কেবল লোকাচার অনুসরণ করিলে, ঐরূপ অনেক নিজের হাতে-গড়া-বিপদে ঠেকিতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধ বেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দ্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

নিম্ন ঈশ্বরলক্ষণসমন্বিত ব্যক্তি "গুরু" হইবার যোগ্যপাত্র।

(১) শান্ত—সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদে অবিচলিত।

(২) দান্ত—বিজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাদি ক্লেশসহিষ্ণু।

(৩) কুলীন—সদাচারাদি নবধা গুণসম্পন্ন।

(৪) বিনীত—গর্ব্বাদি পরিশূন্য, তৃণবৎ সুনীচ।

(৫) শুদ্ধবেশবান্—চিত্তের প্রসন্নতা উদ্দীপক বিশুদ্ধ-বেশ-ধারী।

(৬) শুদ্ধাচার—সন্ধ্যাদি সৎকর্ম্মান্বিত।

(৭) সু প্রতিষ্ঠ—"কৃষ্ণপ্রেমভক্ত" বলিয়া যাহার খ্যাতি আছে।

(৮) শুচি—অন্তর্বাহ্য পবিত্র, অপাপ-বিদ্ধ।

(৯) দক্ষ—সাধন ভজনাদি ক্রিয়া-সমর্থ।

(১০) সুবুদ্ধিমান—সুচতুর, সুমেধা।

(১১) আশ্রমী—চতুরাশ্রমের কোন আশ্রমভুক্ত, (গৃহীকেই গুরু নির্ব্বাচন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য)।

(১২) ধ্যাননিষ্ঠ—ঈশ্বর চিন্তায় এক চিত্ত।

(১৩) তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ—শাস্ত্রদর্শী দেবপূজাদি ক্রিয়া সমর্থ।

(১৪) নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো—প্রকৃত শক্তিশালী, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ। আবশ্যক হইলে সময়ে শিষ্যকে নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

হরিদাস—এপ্রকার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আচার্য্য মিলা দুর্ঘট।

গুরুদেব—তাহা সত্য বটে, তবে শাস্ত্রার্থ স্মরণ রাখিয়া যথা-সম্ভব গুণসম্পন্ন ভক্তিমান পুরুষকে আত্মসমর্পণ করাই ঠিক। অবশিষ্ট পরমগুরু মিলাইয়া দিবেন। উল্লিখিত প্রকার সদ্গুণ-সম্পন্ন, ভক্তি সাধনোদ্দীপ্ত ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন চরিত্রের সহবাসে অলক্ষে তোমার মলিন মায়ামুগ্ধ চরিত্রও সতেজ ও পুণ্যালোকিত হইবে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। অগ্নি গোলকের নিকটস্থ পদার্থে অচিরে অগ্নির উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে উষ্ণ করিয়া তোলে। সাধক যেরূপ মলিন ও পাপদুষ্ট হউন না কেন, সদ্-

গুরুচরণাশ্রয় পাইলে ক্রমে ক্রমে কল্পতরু রসে আপ্লুত হইয়া নবজীবন লাভ করেন। বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব নয়ন মুদ্রিত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিলেন :—

মন গুরু পদে লাগি রবে—
গুরু মোর চৈতন্য, দয়াল অগ্রগণ্য—
পদাশ্রয় তোরে দিবে দিবে ॥
শ্রীগুরু চরণ হৃদয়ে ধরিবে,
ভক্তিবারি দিয়ে ভিজাইয়া নিবে।
প্রেমামৃত রসে বিগলিত হবে,
সেই চরণে সদা মিশে রবে ॥
শ্রদ্ধারজ্জু দিয়ে বাঁধিবে দৃঢ় করি,
ঘন বাঁধন দিবে গুরুপদ স্মরি।
শ্রবণ কীর্ত্তন বারি, তাহাতে গঙ্গারি,
নামামৃত সদা পিবে পিবে ॥
দেখিতে দেখিতে তখন প্রেমাঙ্কুর হবে,
গুরু কৃপাবীর্য্য তাহে সঞ্চারিবে।
সাধন ভজন প্রেম ক্রমে বাড়ি যাবে,
কল্পতরু শাখে জোড় লাগিবে ॥
অচিরাতে গাছের ধর্ম্ম দূরে যাবে,
সব দূরে গিয়ে মূলমাত্র রবে।
কল্পতরু রসে বৃক্ষ ভরি যাবে,
আত্মসাৎ করি নিবে নিবে ॥
সময় বুঝে মালী আপনি আসিবে,
কেমন জোড় হ'ল পরখ করিবে।

বৈরাগ্য ছুরী দিয়ে তার কাটি লবে
ব্রজভূমে নিয়ে তার রোপিবে ॥
ব্রজের মধুর রসে কলম সতেজ হবে,
অচিরাতে তাহে মুকুল ধরিবে।
মন্ত ধরা তাহে পশিতে না পারে
অনুরাগ ছায়ায় তার ঢাকিবে ॥
কৃষ্ণপ্রেমের গুটী আপনি বাড়িবে
মধুর মধুর রসে পরিপূর্ণ হবে।
পরিপক্ক হ'লে শ্রীরাধামাধবে
ভক্তি করি ডালি দিবে দিবে ॥

প্রেমোল্লাসিত হরিদাস তখন সুরে সুরে মিলাইয়া গাহিলেন।

দীন হরিদাসের সেদিন কবে হবে,
কবে গুরু মোরে ব্রজে নিয়ে যাবে।
প্রেমফল মোর কবে বা পাকিবে,
রাধা পদে ডালি দিবে দিবে ॥

হরিদাস—সেই কল্পতরু শাখায় জোড় লাগাইতে পারিলে আর ভাবনা থাকে না। যত কেন ট'কো অপকৃষ্ট আমের চারা হউক না শ্রীগোবিন্দ ভোগের শাখায় সহিত একবার জোড় করিতে পারিলে অবিলম্বে সেও গোবিন্দ ভোগ হইয়া যাইবে। চিন্তামণি যাহাকে স্পর্শ করিবে, এক মুহূর্ত্তে সে কাঞ্চন হইবে। বুঝিলাম সদ্গুরুচরণাশ্রয় অত্যন্ত আবশ্যক।

গুরুদেব—বৎস তোমাকে আবার বলিতেছি যে এই শ্রীচরণাশ্রয়টী পূর্ণমাত্রায় হওয়া চাই, কায়মনোবাক্যে তাঁহাকেই ভবপারের কর্ণধার বলিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বচক্ষু

শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী ; তিনি প্রাণ চাহেন, খাঁটী সোণা চাহেন, গিল্‌টী চাহেন না। কেবল মালা তিলক শিখাসূত্র চাহেন না, উক্ত বৈষ্ণব-চিহ্নসমন্বিত প্রকৃত বৈষ্ণবতা চাহেন। সেখানে ভেল আদৌ চলে না, বা আধাআধি বন্দোবস্তও চলে না। অন্য পরে কা কথা, কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীরা যতক্ষণ বস্ত্রহরণরূপ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ ব্রজরস মাধুরীর পূর্ণ প্রেমলীলা আনন্দরসপূর শ্রীরাসলীলামৃতাস্বাদনের সৌভাগ্য হয় নাই।

হরিদাস—প্রভো, আপনার সঙ্গীতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকেই শ্রীগুরু বলিয়া সূচিত হইয়াছে উপলব্ধি হয়।

শুকদেব—হাঁ তাই বটে, তিনিই জগদ্‌গুরু, তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশামৃত হইতে এবং তাঁহার অমূল্য চরিতামৃত আলোচনায় তাহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

আপনি করিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥

শ্রীল গোস্বামীপাদেরা এই তত্ত্ব উপাসনা-প্রণালীতেও প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত-পদ্মে সহস্রদলশোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানম্ ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েৎ অখিলসিদ্ধিদং॥

যিনি ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্রদল পদ্মমধ্যস্থ কর্ণিকাতে বিরাজিত যিনি শ্রীকর প্রসারিত করিয়া পরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া জীবের

কৈতব দূর করিতেছেন, যিনি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, পীতবর্ণধারী, যিনি অখিল সিদ্ধিদাতা পরমাত্মারূপী সেই শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিবে।

বুঝিলে এই দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, পীতবর্ণধারী কে? ইনি তোমার সিদ্ধিদাতা পরম মঙ্গলালয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি না?

এখানে এই নিগূঢ় তত্ত্ব কিঞ্চিৎ আবরণ মধ্যে থাকিলেও ঐ পীতবর্ণেই ধরা পড়িয়াছেন, ছন্ন কলির প্রচ্ছন্ন অবতার লুকাইয়া থাকিতে চাহেন, কিন্তু ভক্তের নিকট সে লুকোচুরি ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। শ্রীরাসলীলা সময়ে চতুর কানাই লুকাইয়াছিলেন এবং চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীমতী নিকটস্থ হইবামাত্র সব লীলা-চাতুরী ফুরাইয়া গেল, চতুর্ভুজ শ্রীহরি মুহূর্ত্তে দ্বিভুজ মুরলীধর হইলেন, সব গাম্ভীর্য্য ছুটিয়া গেল, পূর্ব্ববৎ বিদগ্ধ হইলেন। লীলাকল্লোল-বারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রের ঐরূপ অনেক বৈচিত্র্য-ভাব হয়। ৺কাশীধামে স্বয়ং জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকর প্রসারিত করিয়া গৌড়েশ্বরের প্রধানামাত্য বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান মহাপ্রবীণ শ্রীসনাতনকে যখন সাধ্যসাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন, সেই সুন্দর চিত্রটী স্মরণ কর। কলিযুগাবতার ব্যাখ্যাকালে মহাপ্রভু বলিতেছেন কি শুন :—

কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীচরিতামৃত।

এখানে পীতবর্ণ স্বরূপ লক্ষণ। কলিতে যিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিতেছেন, তিনি অংশাবতার বা যুগাবতার নহেন, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন। পরম ভাগবত শ্রীসনাতনের বহুবর্ষের সযত্নপোষিত অতি মধুর সিদ্ধান্তটী আজ পাকা হইল, প্রেমে পুল-কিতাঙ্গ হইলেন, লোভ বাড়িল, এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না, সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি (Clear confession) বাহির করিতে হইবে। দেশ, কালসুপাত্রজ্ঞ, সুচতুর সনাতন তাই এখন মুখর হইলেন "প্রভু আমরা কলিহত জীব, কলির অবতারকেই সুনি-শ্চয়রূপে বুঝিতে চাই, দয়া ক'রে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিউন। তখন গৌরগতপ্রাণ শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিতে পলক-বিহীন নয়ন স্থাপিত করিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন—"প্রভো যিনি তপ্তহেমকান্তি প্রকাণ্ড শরীর, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু আজানুলম্বিত-ভুজ, কমললোচন, যিনি শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ, ভক্তবৎসল সুশীল, সর্ব্বভূতে সম, যিনি চন্দনাঙ্গদ মালায় ভূষিত হইয়া শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, তিনিই কলির অবতার কি না নিশ্চয় করিয়া বলুন।" প্রভু একবার ঠেকিলেন, ভক্তের নিকট আর লুকাইতে পারিলেন না, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হ'য়েছে, চাতুরালী ছাড় সনাতন"।

> "অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
> মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥"
>
> শ্রীচরিতামৃত।

আর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি কাহাকে বলে ?

শ্রীল গোস্বামীপাদেরা আরও বিশদ করিয়া শিখাইয়াছেন—

গুরুং গৌরাঙ্গং দ্বিভুজং বরদং করুণেক্ষণম্।
বৃন্দাবন-নিকুঞ্জস্থং কল্পপাদপমূলগং॥
রাধামাধবয়োঃ শ্রেষ্ঠং শ্রীবিশাখা সমন্বিতং।
গোপরামাগণৈঃ যুক্তং বন্দে পতিত পাবনং॥

যাঁহার কমললোচন হইতে অনুক্ষণ কৃপামৃত ক্ষরিত হইতেছে, যিনি যুগলকর উত্তোলন করিয়া জগন্মঙ্গল শ্রীহরি নাম বিতরণ করিতেছেন ও পতিত অধম জনকে বর প্রদান করিতেছেন, যিনি পতিতোদ্ধারণ, যিনি মধুর শ্রীবৃন্দারণ্য মধ্যে শ্রীকল্পতরুমূলে যথায় শ্রীশ্রীরাধানন্দদুলাল সঙ্গিনীগণ পরিবৃত হইয়া রাস-বিলাসরসে নিমগ্ন আছেন, তথায় স্বকীয় পরিকরযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের অতি অন্তরঙ্গা গুরুরূপা শ্রীবিশাখা সখীস্বরূপে বিরাজিতা আছেন, সেই পরমগুরু গৌরাঙ্গসুন্দরকে বন্দনা করি।

হরিদাস—অহো আমরা ধন্য, আমাদের মত সৌভাগ্যবান জগতে আর নাই। আহা, আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের অজস্র কৃপা, তাই ভক্তরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের অতি নিজজন হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন। আবার কেবলমাত্র শাস্ত্র যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা নহে, নিজ জীবনে ও পার্ষদগণের জীবনে নিগূঢ় সূত্রগুলি কার্য্যে আচরণ করিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্ব ফুটাইয়া রাখিয়াছেন। কেবল কথায় ধর্ম্ম শিখান যায় না, তাই শ্রীমুখে বলিয়াছেন:—

"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

কেমন করিয়া সাধনের উত্তুঙ্গ শিখরে ক্রমে ক্রমে উঠিতে হইবে—একদিকে তাঁহার বিধি-নিষেধ সমন্বিত বেদবেদান্তাদি

সমস্ত শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিলেন, অন্যদিকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা কিরূপে ঐ ধর্ম্মশিক্ষা কর্ম্মে পরিণত করিতে হয় তাহাও শিখাইলেন। এ শিক্ষার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নাই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু সমস্ত আশ্রমের শিক্ষা এখানেই পাইবে। এমন পূর্ণ উৎকৃষ্ট শিক্ষা জগতে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। গৌড়-জনের ভাগ্যের অবধি নাই; বাস্তবিক "বাঙ্গালী অবতার" বাঙ্গা-লীর অতি নিজস্ব বস্তু, এমন দুর্লভ রত্নকে যে আমরা চিনিলাম না, ইহাই আক্ষেপ।

গুরুদেব—বৎস, আমরা যে মহাভাগ্যবান্ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমরা জগতের যতটুকু খবর রাখি, তন্মধ্যে এই ভারত-ভূমিই ধর্ম্মজগতের কেন্দ্রস্থিত মধ্যমণি, আবার হিন্দুরাই সেই মহারত্নের শ্রেষ্ঠী, অধুনা গৌড়জনেরাই সেই মহারত্নের একচেটিয়া সনন্দ (Monopoly) পাইয়াছে। এই চিন্তামণির সংবাদ সমুদ্র-পারে গিয়াছে, অচিরাতে সভ্যজগৎ ছাইয়া পড়িবে।

হরিদাস—প্রভু, তিনি জগদ্‌গুরু হইয়া আবার অন্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইলেন কি জন্য ?

গুরুদেব—লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্তই অদ্ভুত লীলা; তিনি মানবলীলায় ঠিক মানবাচরণ স্বীকার করিয়াছেন, নচেৎ সাধারণে শিখিবে কেন ? ইহাই এই অবতারের বিশিষ্টতা। তবু অগ্রবৎ শ্রীমন্ত্রটী প্রথমে গুরুদেবের কর্ণে দিয়া পরে সেই মন্ত্র নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জগদ্‌গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব উভয় দিক্ বজায় রহিল।

হরিদাস - বুঝিলাম, কিন্তু আর একটি নূতন গোলে পড়িলাম; শ্রীচরিতামৃতে পাইয়াছি—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই॥

রাধা+কৃষ্ণ=শ্রীগৌরাঙ্গ, এখন শুনিতেছি—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগুরু!—আবার তিনি রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠ। তিনি নিজে শ্রীরাধামাধব একাধারে হইলেন, আবার তাঁহাদের প্রেষ্ঠালি হইলেন কিরূপে?

গুরুদেব—ইহাতে গোল কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর=(রাধা+কৃষ্ণ) বটেন; আবার তিনিই গুরুরূপা শ্রীবিশাখা সখি বটেন। রসতত্ত্ববারিধি শ্রীপাদ স্বরূপগোস্বামী নিজকৃত কড়চায় মহাপ্রভুতত্ত্বের কিরূপ বিচার করিয়াছেন দেখ—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা।
দেকাত্মনাবপি ভুবি পূরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রুতি বলিতেছেন—“একমেবাদ্বিতীয়ং”। শ্রীচরিতামৃত বলিতেছেন—“অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ,” ইহা মূল কথা। এখানে প্রকৃতি পুরুষের অন্তর্নিবিষ্ট রহিলেন, সুতরাং এক আত্মা; ইহা নিত্যবস্তু আবার অনাদিকাল হইতে পুরুষ-প্রকৃতি লীলারসাসক্ত হইয়া অন্যোন্যে বিলাস করিতেছেন। এখানেও “রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান” ইহাও নিত্যবস্তু,

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাবাস শ্রীগোলকবৃন্দাবনও নিত্যবস্তু, তথায় যুগল মূর্ত্তিতে নিত্যলীলা হইতেছে। অধুনা শ্রীনবদ্বীপে পুরুষ প্রকৃতি একত্রীভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দররূপে প্রকট হইলেন। শ্রীভগবান বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়; তাঁহাতে দেশ কালের কোন ব্যবধান থাকিতে পারে না। পূর্ণ ও অনন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই পূর্ণ ও অনন্ত। শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়াও পৃথকরূপে প্রতিভাত, আবার পৃথক প্রকাশ হইয়াও একবস্তু; ইহাকেই বলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। ইহাই শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলভিত্তি। স্বরূপ গোস্বামী আরও কি বুঝাইলেন শুন।

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সারভূতা মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীনাম্নীস্বরূপশক্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মূলতঃ অভিন্নাত্মা। অথচ নিত্যলীলায় যুগলমূর্ত্তিতে নিত্যকাল নিত্যধাম শ্রীগোলকবৃন্দাবনে বিরাজিত। তবে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশচতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে এই ভূমণ্ডলে রাধা কৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করিয়া প্রাকৃতচক্ষুগোচর হইয়াছেন। পরস্পর মধুর ব্রজ-রসমাধুরী আস্বাদনই প্রকট লীলার উদ্দেশ্য। আবার এক্ষণে অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবরসাস্বাদনের নিমিত্ত ঐ দুই মূর্ত্তি একীভূত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইলেন। সমকালেই বিভিন্ন বিলাস বুঝিতে হইবে।

হরিদাস—প্রভো! এক সময়ে বিভিন্নরূপে প্রকাশ, তাহা ঠিক বুঝিবার সাধ্য হইতেছে না।

গুরুদেব—আমরা মায়াচ্ছন্ন সান্ত জীব, পরিমিত নিকৃষ্টবুদ্ধির দ্বারা অবিচিন্ত্য মহাশক্তির ধারণা করা সহজ নহে। লবণের পুতুল সমুদ্র মাপ করিতে পারে না। যিনি গোলকবিহারী শ্যাম-

সুন্দর মদনমোহন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী রাসবিলাসী গোপীনাথ, তিনিই শ্রীনবদ্বীপবিহারী সংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরি; আবার তিনিই পরমাত্মারূপী সর্ব্বজীবাধিষ্ঠিত শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে শ্রীরাধামাধবের বামদেশে অবস্থিত পরম অন্তরঙ্গ শ্রীবিশাখা সখী। যাত্রাদলে এক গোবিন্দ পাকা দাড়ি পরিয়া বীণাহস্তে পরম কৃষ্ণভক্ত শ্রীনারদ হইয়া আসিলেন, আবার কালো শ্মশ্রুগুম্ফ লাগাইয়া, তাজ পরিয়া কৃষ্ণদ্বেষী হিরণ্যকশিপু হইয়া দেখা দিলেন, আবার পরক্ষণেই শশ্রুগুম্ফ শূন্য প্রহ্লাদমাতা কয়াধু হইয়া আবির্ভূত হইলেন। যে চিনিল সে বুঝিল এক গোবিন্দ ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশ।

হরিদাস—তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু এক সময়ে একই স্থানে বিভিন্ন প্রকাশ বুঝিব কিরূপে?

গুরুদেব—পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি দেশকালাতীত; ইহাই অচিন্ত্যশক্তি তর্কযুক্তি দ্বারা ইহা বোধগম্য নহে।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চতদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয়॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভপাকে পচে সেই তার নাহিক নিস্তার॥

শ্রীচরিতামৃত।

তুমি অবশ্য বায়স্কোপ (Biosoope) দেখিয়াছ, কেমন একটী মানুষ হ'তে টুক্ টুক্ ক'রে দশ বারটী লোক বাহির হইল; কেহ প্রভু সাজিল, কেহ ভৃত্য সাজিল, আবার কর্ম্মাবসানে সব একে একে সেই মূলচিত্রে মিশিয়া গেল। ইহা দ্বারা সেই অপ্রাকৃত লীলার কতক আভাস বুঝা যায়।

পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তাই বিবিধ বিভেদ॥ শ্রীচরিতামৃত

ইহাই লীলাবৈচিত্র; ইহাতে বিশ্বাস না করিলে শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্ত্বায় অবিশ্বাসী হইতে হয়।

এক কাঁচ্চা বুদ্ধি লইয়া আমরা বুঝিতে না পারিলেই তাহা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। "উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর" তুমি ধারণা করিতে পার না বলিয়া কি অসম্ভব বলিবে? তারবিহীন বার্ত্তাবহ (Wireless Telegraphy) আমার ক্ষুদ্র মস্তিকে প্রবেশ করিতেছে না বলিয়া কি উহা বিকৃত মস্তিকের বিক্ষেপ বলিব? অদ্ভুদকর্ম্মা রামমূর্ত্তির অদ্ভুত শক্তির পরিচয় স্বচক্ষে না দেখিলে, ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যবক্ষে প্রকাণ্ড হস্তী চাপিবার কথা কে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যে এসমস্ত সম্ভব হইলে, সর্ব্বশক্তিমান পরমপুরুষের অসাধ্য কি? তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অলৌকিক কার্য্যে যেজন না করে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার দুইলোক নাশ॥

হরিদাস—শ্রীবৃন্দাবন নিত্যধাম, শ্রীব্রজবিলাসও নিত্যবস্তু, সে স্থলে 'ভূমি পূর্ণ' কথাটিতে যেন নিত্যত্বের ভ্রংশ হয়।

গুরুদেব—মহাজনবাক্যে ভ্রমপ্রমাদ নাই। সূর্য্য অনুক্ষণ স্বপ্রকাশ, তবে "এইমাত্র এখানে উঠিলেন" অর্থে এইমাত্র আমাদের নয়নগোচর হইলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

হরিদাস—প্রভো! ক্ষমা করিবেন, অনেকে মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া মানিতে চাহেন না; তাঁহার ঈশ্বরত্বের শাস্ত্রপ্রমাণ কি?

গুরুদেব—বৎস, একথা আর নূতন কি? সর্ব্বদেশে সর্ব্বস্থানে এই চিত্রই হইয়া থাকে। নচেৎ মায়ার রাজ্য টিকিবে কেন?

> ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
> সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল কবিরাজগোস্বামী অতি সুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীতে তাঁহার স্বকীয় স্বরূপ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি।

পূর্ব্বে পাইয়াছ যে, শ্রীসনাতন-শিক্ষা সময়ে মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আবার অন্য চিত্র দেখ—

রসিকেন্দ্র চূড়ামণি গোপীজন-মনোহর শ্রীনন্দনন্দনের এবার নূতন লীলা। এবার ছন্ন কলিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ; তাই কাল অঙ্গ গৌরাঙ্গ করিয়াছেন, চাচর চিকুর মুড়াইয়া মুণ্ডিত-মস্তক হইয়াছেন; মোহন বেণু ছাড়িয়া দণ্ড লইয়াছেন। চক্ষুের লাজলজ্জা উত্তম হইয়াছে, ছদ্মবেশে সকলের চক্ষে বেশ্ ধুলি দিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন; শেষে সন্ন্যাসী সাজিয়া শ্রীবিশাখা

(রায় রামানন্দ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ইষ্টগোষ্ঠী, পরে সাধনতত্ত্ব রসতত্ত্বের আলাপ হইল, তখনও ধরা পড়েন নাই। ভাবিয়াছিলেন সেখানেও চতুরতা চলিবে, কিন্তু বিশাখা সখীও কম চতুরা নহেন, মায়া কুহেলিকায় কিছুক্ষণ তাঁহার চক্ষুকে ঝলসিয়া রাখিলেও অবিলম্বেই সাহজিক প্রেমদৃষ্টির বিকাশ হইল। তিনি সন্ন্যাসিশ্রীমূর্ত্তিতে তখন কাঞ্চন-পঞ্চালিকায় আচ্ছাদিত তাঁহাদের সেই সবংশীবদন সুপরিচিত খঞ্জনময়ন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, ওহে সন্ন্যাসীঠাকুর, চাতুরালীর আর কি স্থান নাই? তুমি কে বল? ভাল মানুষের মত এখনই পরিচয় দেও, নচেৎ এখনি সব ভারিভুরি ভাঙ্গিয়া দিব।

"বিশাখা কহিছে বাণী শুন ওহে চিন্তামণি
কেন আর করহে ছলনা।
তুমি যতই লুকা'তে চাও ততই বেকত হও
তবু তোমার স্বভাব ছাড়না॥"

তবু বিদগ্ধরাজ চতুরতা খেলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া শেষে সমস্ত অকপটে বলিয়া ফেলিলেন। মিষ্ট কথায় মুখরাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। "তোমার নিকট লুকোচুরি চলে না; তুমিই ত নাটের গুরু, আমি লুকাতে গেলেও তুমি প্রেমবলে ধরিয়া ফেল, তুমি নিত্যলীলার নিত্যসিদ্ধা পরম অন্তরঙ্গা বিশাখা সখী, আমাদের সমস্ত তত্ত্বলীলা তোমাকে লইয়া, তোমাকে সেই নিগূঢ় রহস্য বলিতে, বা সেইরূপ দেখাইতে কোন বাধা নাই; এই যে গৌর অঙ্গ দেখিতেছ, উহা আমার নিজস্ব

বস্তু নহে, উহা হেমবরণী শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গস্পর্শে উদ্ভূত হইয়াছে। আজিকে তাহা আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু শ্রীমতী কৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীনন্দদুলাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি সেই প্রেমময়ীর ভাবে আত্ম মন আরোপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ ভাব ও কান্তিযুক্ত হইয়াছি।

"রাধাদেহরুচাভূতং কৃতমিদং শ্যামোঽপি গৌরোঽভবৎ"

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ।

ইহাই অত্যদ্ভুদ্ হইল যে, শ্রীরাধার দেহকান্তিতে শ্যামসুন্দরও গৌরবর্ণ হইলেন।

"ভাবিতে ভাবিতে রাধা ভাবেতে হয় কৃষ্ণ রাধা"।

এই বলিয়া রসরাজ মহাভাব দুই শ্রীমূর্ত্তি ও অদ্ভুত মিলনে একীভূত মূর্ত্তি দেখাইলেন। রায় রামানন্দ সে উচ্ছ্বসিত প্রেম-তরঙ্গ সামলাইতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন।

কেমন এখন শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিলে? শাস্ত্রযুক্তি দূরের কথা, একেবারে স্বয়ং তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical analysis) ক'রে বুঝাইয়া দিলেন; তবু যিনি না বুঝিবেন, তাঁহাকে ভগবান্ এখন বুঝাইবেন না বুঝিতে হইবে।

হরিদাস—শ্রীগুরু যখন স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ, তখন আবার শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ বলিবার প্রয়োজন কি?

গুরুদেব—বৎস, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন একমাত্র ভক্তিসাধনে লভ্য। ভক্তি বহুবিধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। তন্মধ্যে রাগভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা শুদ্ধ প্রেমিক ব্রজবাসিগণের নিজস্ব বস্তু। এবিষয় বিস্তারিতভাবে পরে আস্বাদন করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরস

আস্বাদন এই রাগমার্গ ভিন্ন অন্ত প্রকারে সংঘটিত হয় না। মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন—

কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি তপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

এই রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইলে শুদ্ধ মধুর ব্রজভাবে অর্থাৎ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন, পতি, পুত্র বা সখা-ভাবে, (ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র থাকিবে না) ভজন করিতে হয়, ব্রজবাসীদের সেই সম্বন্ধ অনুকরণে গুরুরূপা সখীর অনুগা হ'য়ে ভজন করিতে হইবে।

সখীর অনুগা হ'য়ে সিদ্ধসেবা লব চেয়ে
ইঙ্গিতে করিব সব কাজে॥

স্বাধীনভাবে ভজনে ইহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

সুতরাং রাগানুগপন্থী সাধকগণ তাই অভিন্নস্বরূপ হইলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির বামভাগে গুরুরূপা সখীকে পৃথক্‌ভাবে ধ্যানধারণা করেন। সেইজন্ত "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" স্থানে গোস্বামিপাদেরা "মাং" অর্থে মদীয়ং শ্রেষ্ঠং করিয়াছেন।

হরিদাস—শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুরূপা বিশাখাসখীরূপে প্রকট হইবার উদ্দেশ্য কি?

গুরুদেব—শ্রীবিশাখাসুন্দরী মূল গুরু, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-শিক্ষয়িত্রী, সুতরাং সকলেরই গুরু, এদিকে মহাপ্রভুও জগদ্‌গুরু। এই রাগভক্তির প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনি প্রকটলীলায় এই রাগভক্তির অবতারণা করেন।

"যে লাগি (কৃষ্ণ) অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যৈন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥"

এই রাগমার্গ ভজনের সূত্রকর্ত্তা স্বয়ং গোলকবিহারী শ্রীনন্দ-নন্দন, দ্বাপরের শেষভাগে ইহার প্রবর্ত্তন। আবার কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত রূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, সেই সূত্রকর্ত্তা, শ্রীনন্দদুলাল শচীর দুলাল হইয়া উক্ত সূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা হইলেন। কেবল লোকশিক্ষাই এ স্থলের উদ্দেশ্য, সুতরাং তিনিই লোকগুরু কিনা বুঝ। তিনি ঐ সমস্ত নিগূঢ় সূত্রের বিমল ভাষ্য করিলেন এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন।

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

ব্রজভাব ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিজস্ব বস্তু, তাহা তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ প্রচার করিতে সমর্থ নহেন। তাই আবার যথাসময়ে কলির জীবের প্রতি সদয় হইয়া করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া নিগূঢ় ব্রজরসমাধুরী জীবকে শিক্ষা দিলেন।

যে সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ জীবের হয় জ্ঞান॥

এখন বুঝিলে, কিজন্য মহাপ্রভুকে জগদ্‌গুরু হইতে হইয়াছে। অতএব আইস আমরা প্রেমানন্দে সেই পরম দয়াল জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে নমস্কার করি—শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীগুরুদেব—বৎস, দেখিয়া সুখী হইলাম, আজকাল উচ্চ ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় যে অবশ্যকর্ত্তব্য সেভাব অনেকটা আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হইতে এই তত্ত্বটী আরও বিকশিত হইয়াছে; পরমহংসদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে "ঠাকুর ভগবান্" বলিয়াই জানেন। ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"The soul can *only* receive impulse from another soul and from

nothing else. The person from whose soul such impulse comes, is called the Guru."

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্য কোথাও মিলেনা, কেবলমাত্র আত্মার আত্মায় সঞ্চারিত হয়। যে উন্নত ব্যক্তির আত্মা হইতে এই ধর্ম্মভাব অনুক্রামিত হয় তিনিই গুরুদেব।

হরিদাস—তাহা একরূপ বুঝা গিয়াছে, কিন্তু—

"যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ।
নিষ্ঠা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ॥"

এই মহাবাক্যের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস আসিয়াও আসিতেছে না। একবার বিশ্বাস আইসে, কিন্তু পরক্ষণেই বিচারবুদ্ধি আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়।

গুরুদেব—ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ। অজ্ঞানতা জীবের আদিম অবস্থা, এরূপ কুজ্ঞান অপেক্ষা তাহা শুভকর, তখন জীব সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যে বিশ্বাস হারায় না, বরং অন্ধ হইয়া তাহাতেই লাগিয়া থাকে। তৎপরে জ্ঞানাভিমান, ইহাই সর্ব্বনাশের মূল, প্রকৃত জ্ঞান হইল না অথচ জ্ঞানগরিমা আসিয়া স্বাভাবিক নির্ভরতার ভাবটীকে তাড়াইয়া দিল; জীব তখন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইলেন, ধরা সরা দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্ববিষয়ে সংশয়, কুতর্ক সংশয়বুদ্ধিকে আরও তমসাচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখন বিনাশের পথ নিকটবর্ত্তী হইল, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" মহাজনবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া, জীব উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল, ইহাই মানবজীবনের অমাবস্যা রজনী। কালক্রমে সদ্গুরুরূপ চন্দ্রের উদয় হইলে গুরুপক্ষের রজনীর ন্যায় ক্রমে

ক্রমে তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতে থাকে; আবার পূর্ণিমার উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞানালোকিত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। শিশু সরলমতি অজ্ঞান, পিতামাতাকে দেবতা বলিয়া জানে, তাঁহারা প্রস্তরময়ী মুর্ত্তিকে "ঠাকুর" বলিয়া দিয়াছেন, শিশু অটলভাবে তাই ধরিয়া রহিয়াছে, সে কোন বিচারকে আহ্বান করিতেছে না, কিন্তু যেমন জ্ঞানের মুখোস পরিয়া কুজ্ঞান-কৈতব তাহার স্কন্ধে ভর করিল, অমনি সেই পরমারাধ্য পিতামাতা "বৃদ্ধ বলদ" (Old fools) হইলেন, আর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ জড় পাষাণ হইলেন। আবার যখন ভগবৎকৃপায় জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল তখন আবার বুঝিল—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥

সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন—

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ॥

তখন তিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানকে বীজস্বরূপ দেখিতেছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করেন এবং সেই ভগবানে

সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

অজ্ঞান সরলমতি শিশুর সিদ্ধান্ত—

"গুরুর কথা না শুন কাণে।
প্রাণ যাবে হড়কা টানে॥"

অবশ্য ইহা আর্ত্তবুদ্ধিযুক্ত বলিয়া সকাম, কিন্তু পূর্ণ নির্ভরতা-ব্যঞ্জক।

কুজ্ঞানবিকৃত মদমত্ত যুবকের সিদ্ধান্ত—

"বিচারে জিতিলে তবে গুরু করি জানি।
যুক্তি তর্কে না টিকিলে বেদ নাহি মানি॥"

তত্ত্বানুসন্ধিৎসা থাকিলে যুক্তি তর্ক নিন্দনীয় নহে, কিন্তু শুষ্ক-তর্কপ্রবণতা সর্ব্বনাশের কারণ হয়।

আবার তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপ্ত সাধকের সিদ্ধান্ত—

"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।"
"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥"

ইহা পূর্ণ নির্ভরতাসূচক নিষ্কাম ভাব, বালকের সিদ্ধান্তই আবার পাকা হইয়া ঘুরিয়া আসিল।

হরিদাস—তবে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে না যাওয়াই ত উত্তম দেখিতেছি।

গুরুদেব—উত্তম বটে, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আরও উত্তম। শাস্ত্রের কোন দোষ নাই, দোষ আমাদের; আমরা শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া লোকাচারের খাতির করিতে যাইয়াই ডুবিয়াছি। মূলবস্তু ছাড়িয়া খোসা লইয়া বসিয়া আছি, তাই

এই দুর্গতি। কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছেন—"Woe unto the Nation that forgets the real, internal, spiritual essentials of religion and mechanically cluches with death-like grasp at all the external forms and never lets them go"

যে জাতি ধর্ম্মের নিগূঢ়, সারভূত, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি ভুলিয়া গিয়া বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে মরার কামড়ের ন্যায় কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে, আর কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, সে জাতির দুর্গতি বাস্তবিক ক্লেশদায়ক।

হরিদাস—বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার উপায় কি?

গুরুদেব—জীবের এই ভীষণ ব্যাধি হইবে জানিয়াই পরম দয়ালু ভগবান্ তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

হে উদ্ধব! যতদিন নির্ব্বেদ (বিষয়ভোগে বৈরাগ্য) না জন্মিতেছে, বা আমার কথাদিতে অর্থাৎ শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা শব্দে কহি বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়) না জন্মিতেছে, ততদিন জোর করিয়া শাস্ত্রোক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতেই হইবে। তুলার বালিশ জলে ডুবিতে চাহে না, জোর করিয়া ডুবাইতে ডুবাইতে ক্রমে তুলা ভিজিয়া যাইবে, তখন টুপ্ করিয়া তলাইয়া যাইবে। ইহার নামই সাধনা বা অনুশীলন।

আমার কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে আমাকে ভালরূপ জানা চাই, বিশেষতঃ একবার যখন সহজ বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, তখন

ভাল ক'রে আমায় তত্ত্ব না জানিলে মন ফিরিবে কেন? তুমি ছাদের উপর থেকে নামিতে চাও, আমি হাত উঁচু করিয়া স্থির বলিতেছি "আমার হাতের উপর সটান অঙ্গ ছাড়িয়া দাও, আমি নামাইয়া লইতেছি"। তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না, আমার হাতও দেখিতে পাইতেছ না, কেবল আমার কথা শুনিতেছ, তাহাও কখন সত্য মনে হইতেছে কখনও "অশরীরিণী বাণী" বোধ হইতেছে, আবার কখনও বা মরীচিকা ভ্রম (Illusion) ব'লিয়া প্রতীতি হইতেছে, এ অবস্থায় তুমি কিরূপে আত্মসমর্পণ করিবে? "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" ইনিই রক্ষা করিতে সমর্থ এই দৃঢ় বিশ্বাস আগে আসিলে তবে "গোপ্তৃত্বে বরণ" অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া আত্মনিবেদন আসিবে। সর্ব্বপ্রথমে "আমাকে" জানিতে হইবে, 'আমাকে সমর্থ' বলিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই আমার উপর পাকা বিশ্বাস আসিবে। আমায় জানিতে হইলে আমার গুণকর্ম্ম দ্বারা জানিতে হইবে, যেহেতু আমি অপ্রাকৃত বস্তু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত নহি, কেবলমাত্র ভক্তিযোগে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা আমার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়া থাকে।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্তভক্তিদ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয় আত্মারূপে লাভ করেন, চণ্ডালও আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি করিয়া জাতি দোষ হইতে পবিত্র হইতে পারে।

আমি বেদাদিতে দুর্লভ, কেবল আমার ভক্তের নিকট সুলভ।

"বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ" (ব্রহ্মসংহিতা)। আর আমিই শ্রীভাগবত, "কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়" ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিলে আমাকেই পাইবে। আবার— "সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্ সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্" (শ্রীমদ্ভাগবত)। সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, সুতরাং সাধুসঙ্গ করিলে আমারই সঙ্গ করা হইবে এবং তাহাতেই আমাকে জানিতে পারিবে। আর "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে" অতএব শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিলে আমাকেই জানিতে পারিবে।

জগজ্জীবের পরম সৌভাগ্যবলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মধ্যে একাধারে এই চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তির অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, তিনিই মূর্ত্তিমান্ ভাগবত, তিনিই ভক্তরূপধারী, আবার তিনিই জগদ্গুরু।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

শ্রীচরিতামৃত।

তাঁহা হইতেই সর্ব্বশাস্ত্রের উৎপত্তি, তিনিই ভক্তিশাস্ত্রের জীবন্তমূর্ত্তি, আবার তিনিই ভক্তরূপে ভগবান্।

"একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥

শ্রীচরিতামৃত।

তিনিই আবার গুরুরূপে জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

শ্রীচরিতামৃত।

তাই মানবজাতির অনন্তকাল সাধনের দিব্যফলস্বরূপ সেই অপূর্ব্ব পরম সুন্দরবস্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উদয় হইয়াছে। যাঁহারা সেই দুর্লভ চিন্তামণি ধনকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ত-তম মহাভাগবত শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামী সেইজন্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতেছেন—

"চৈতন্যসমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে ধন্য॥"

শ্রীচরিতামৃত।

বৎস, তিনিই কৃপালু, তিনিই বদান্য, তিনিই ভক্তবৎসল, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিও না, বৃথা অবিশ্বাসী হইয়া অপরাধী হইও না, আর বেশী বিচারের প্রয়োজন কি, একবার ভক্তিভাবে কর্ম্ম করিয়া দেখ, তখন তুমিও ঐ বৃদ্ধ কবিরাজগোস্বামীর সহিত এককণ্ঠ হইয়া বলিবে—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

কলিহত জীবের জন্ত তিনি পরম ব্যাকুল, তাই এখনও আমাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া করুণ-হস্ত তুলিয়া ডাকিতেছেন, আর পরমমঙ্গল হরিনাম বিলাইতেছেন। চক্ষে দেখিয়াও যদি

সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে না পার, তবে তুমি অপরাধী, মন্দভাগ্য, তোমার শুভদিন এখনও বহুদূরে। জীব-দুঃখকাতর বৃদ্ধভক্ত কিছুতেই থাকিতে পারিতেছেন না, ৯০ বৎসরের জরাতুর বৃদ্ধ, তাই বারংবার ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দোহাই দিয়া বলিতেছেন—

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

শ্রীচরিতামৃত।

কি অপূর্ব্ব পরহিতৈষণা! ভাইরে প্রাণপণ হইয়া একবার নাম লইয়া দেখ, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদয় হইবে।

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্যনাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সেই হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে ভজিলেই তিনি করেন উদ্ধার॥

জাতি কুল, ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত পাপী সাধু কোনও বিচার নাই, প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই হইল।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ, কৃষ্ণোজনেভ্য
স্তমহমং প্রপদ্যে॥

শ্রীচরিতামৃত।

তাঁহার নিজস্ব নামামৃত, যাহা চিরদিন গুপ্ত ছিল, যাহা কোন

অবতারে বিতরিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপ ধারণ করিয়া সেই অনর্পিত দেবদুর্লভরত্ন অবিচারে বিতরণ করিলেন, এবং পামর পাপী হইতেই বিতরণ আরম্ভ হইল। এমন দয়ালু শ্রীচৈতন্য দেবের নিকট প্রপন্ন হইয়া আমি শরণ লইতেছি।

এমন দয়ালু আর হইতে নাই, অতএব সংশয়শূন্য হইয়া নির্ব্বন্ধ-সহকারে সেই জগদ্গুরু মহাপ্রভুর কথায় দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে, একবার মন খুলিয়া বল—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই বস্তু সার॥

শ্রীচরিতামৃত।

বিশ্বাস কর, বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া দেখ, নিজেই তখন সব বুঝিতে পারিবে—

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

হরিদাস—সর্ব্বশাস্ত্রেই ঐ কথা বলিতেছে, যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন—"Believe me I will lead you to Heaven."

"আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস কর আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব।"

গুরুদেব—সত্য, দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন হয় না, উহা একজনেরই কথা, ভিন্ন ভিন্ন আধার হইতে উচ্চারিত হইতেছে মাত্র। শ্রীগুরু স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ, তাই মোহান্ধ জীবকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা চৈতন্য দান করেন। সুতরাং গুরুদেবই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশমূর্ত্তি, যেমন শালগ্রামশিলা সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ জগদগুরুর প্রতিবিম্ব, তাঁহার

আশ্রয় লও, তিনিই পাপরূপ কংস ধ্বংস করিয়া, তোমাকে ভব কারাগার হইতে মুক্ত করিবেন। তিনিই কংসারি, তিনিই কৃষ্ণ, এখন বুঝিলে কি না? "যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ" সাধক জীবনে প্রতিফলিত উদাহরণ দ্বারা বোধ হয় আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে, তবে শুন—

মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়ভক্ত শ্রীমান্ রঘুনাথদাস গোস্বামী। তাঁহাকে তিনি নিজ হাতে গড়িয়া ঠিক মনের মত করিয়া লইয়াছিলেন। রঘুনাথ সপ্তগ্রামের দ্বাদশলক্ষের অধিপতি গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র। রঘুনাথ বাল্যে পরমভাগবত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়াছিলেন, তাই বিষয়ভোগ-লালসা কখনই তাঁহাকে আঁটিয়া বাঁধিতে পারে নাই। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যখন শ্রীনবদ্বীপ-শান্তিপুর টলমল করিতেছিল, যখন নানা দেশবিদেশ হইতে ভক্তমহাজনেরা অদ্ভুত সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ছুটিতেছিলেন, বালক রঘুনাথও ঠিক সেই সময়ে সেই মহাসমুদ্রের প্রবলটানে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তিনি অভীষ্টদেব সন্দর্শন জন্য নানা ছলে কৌশলে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু বিষয়-সুখাভিলাষী পিতা বার বার তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে উদিত হইলেন, যখন দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একেবারে পাগল হইয়া নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে ছুটিল, সেই সময়ে বালক রঘুনাথও নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মন কিছুতেই আর ধৈর্য্য মানিতেছে না, রঘুনাথ পিতৃদেবের শ্রীচরণে পতিত হইয়া, করযোড়ে আদেশ ভিক্ষা চাহিলেন, গোবর্দ্ধন সানন্দে অনুমতি দিলেন, রঘুনাথের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

চিরবাঞ্ছিত মনের দেবতাকে সাতদিন ধরিয়া দর্শন করিলেন কিন্তু পিপাসা মিটিল না, সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় জল পাইয়া দুর্ব্বার পিপাসা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। দারুণ পিপাসায় বালক পাগল হইয়া উঠিল, আবার ছুটাছুটি আরম্ভ হইল, ঘরে আর কিছুতেই মন তিষ্ঠিতেছে না, বিষয় একেবারে বিষ হইয়া উঠিল। রঘুনাথ মহেন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য এবং অপ্সরাসদৃশ সুন্দরী স্ত্রীকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া, মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখনও কর্ম্মবন্ধন ছুটে নাই, তাই সংসারের পিতামাতা রঘুনাথের ইষ্টপথের বিষম শত্রু হইলেন। তাঁহারা রঘুনাথকে নজরবন্দী কয়েদ করিলেন। কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইল। আটজন প্রহরী ও পাঁচজন পরিচারক দিবানিশি রঘুনাথকে ঘেরিয়া রহিল। অনন্যোপায় রঘুনাথ তখন প্রপন্ন হইয়া, সেই অগত্যেকগতি ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পদচিন্তা করিতে লাগিলেন—"প্রভো আর ত বাঁচিনা, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে শতবৃশ্চিকে দংশন করিতেছে, চরণাশ্রয় দিয়া আমাকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করুন" রঘুনাথের কাতর ক্রন্দন এতদিনে বুঝি প্রভু-চরণে পৌঁছিল। যিনি ভবপারাবারের কর্ণধার—কখন্ ভবজলধি পাড়ি দিতে হইবে, তাহা তিনিই উত্তম জানেন, সে সব ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, তোমাকে কেবল ডাকিতে হইবে। তাই একদিন রজনীশেষে প্রহরীবেষ্টিত চত্বরমধ্যে আর্ত্ত রঘুনাথ একটী সুদীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ঐ মনুষ্যমূর্ত্তি ক্রমে রঘুনাথের সমীপস্থ হইতে লাগিল। বিস্মিত রঘুনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিলেন তিনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু মৃদুপাদবিক্ষেপে

ঐ শ্রীমূর্ত্তি রঘুনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিহ্বল রঘুনাথ বুঝিলেন না, কেমন করিয়া রুদ্ধ লৌহদরজা উন্মুক্ত হইল। কি অদ্ভুত! অমানুষিক মন্ত্রপ্রভাবে অষ্ট প্রহরী ও পঞ্চ পরি-চারক একসময়ে নিদ্রায় অচেতন রহিল, কিরূপেই বা এই রজনীর শেষভাগে তাঁহার ভবপারের কর্ণধার, তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইলেন। সমস্তই রঘুনাথের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। "রঘুনাথ আইস" বলিয়া তিনি রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া চলিলেন। সুদীর্ঘবপু উজ্জ্বলমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য অগ্রে, আর বিস্ময়বিহ্বল শিষ্য বালক রঘুনাথ পশ্চাতে। কিরূপে ভবসংসার কারাগার হইতে গুরুদেব শিষ্যকে হাতে ধরিয়া উদ্ধার করিতেছেন। একবার মানসনেত্রে দেখ, যেন স্বর্গ হইতে দেবাদি-দেব মহাদেব ত্রিশূল হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়া শরণাগত গয়াসুরকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গই বল, আর শ্রীকৃষ্ণই বল, স্বয়ং তিনি ইষ্টদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। গুরুদেব যদুনন্দনের এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহাতে তাঁহাকে অত গভীর রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিতেই হইবে। ১২। ১৩ জন লোক ঠিক তন্মুহূর্ত্তে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, আবার ঠিক তৎসময়ে ভুলক্রমে সদর দরজা উন্মুক্ত; ইহার কোন পার্থিব হেতু নাই, এ সমস্তই সেই লীলাকল্লোল-বারিধির অপূর্ব্ব লীলা, সেই চক্রীর চক্র, মহাপ্রভুর ভঙ্গী। বলা বাহুল্য এইবার রঘুনাথ যে গৃহত্যাগ করিলেন, কেহই আর তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

এইবারে তিনি তাঁহার প্রাণারাম পরমদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে যাইয়া আশ্রয় পাইলেন।

হরিদাস তুমি বলিবে, উদ্ধারকর্ত্তা গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাই বটে, কিন্তু যদি যদুনন্দনের সাক্ষ্য লও, তিনি বলিবেন "রঘুনাথের উদ্ধারকল্পে আমি যে কিছু করিয়াছিলাম, তাহা আমি জানিনা।"। স্বয়ং রঘুনাথের স্বীকারোক্তি বিচার করিলে অন্যরূপ পাইবে। রঘুনাথ নিজকৃত গৌরাঙ্গস্তবে বলিয়াছেন—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

যিনি কামিনী-কাঞ্চন-ভোগ-লালসা হইতে এই চরণাশ্রিত জনকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া স্বকীয় অভিন্নস্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অতি কুজন যে আমি, আমাকে ন্যস্ত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। যিনি নিজ বক্ষের অতিপ্রিয় গুঞ্জা-মালা উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এবং তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গসুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাসের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য, তিনি সব শুনিয়া বুঝিলেন এ সমস্তই মহাপ্রভুর ভঙ্গী, তাই বলিলেন—

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

যিনি ভঙ্গী করিয়া নিজ কৃপারজ্জু দ্বারা রঘুনাথ দাসকে কুগৃহ-রূপ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজস্বরূপ শ্রীদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হই।

এইখানেই এই রহস্য শেষ হইল না, যখন বালক রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং মহাপ্রভু বলিলেন—

"প্রভু কহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গনিষ্ঠমন রঘুনাথ ঐ কথায় সায় পুরিলেন না, মনে মনে বলিলেন—

"রঘুনাথ মনে কহে "কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমা কৃপা কাড়িল আমায় এই আমি জানি॥"

রঘুনাথের জীবনের এই সত্যঘটনা হইতে আমরা দেখিতেছি, রঘুনাথের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহার গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য। রঘুনাথ নিজে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন, উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।

আবার স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন, উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ। কোনটীই মিথ্যা নহে, একই বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ, তাই "যেই গুরু = সেই কৃষ্ণ = সেই সে গৌরাঙ্গ।"

হরিদাস গুরুপাদমূলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন, বলিলেন— "কৃতার্থোঽহম্"।

কৌলিকগুরু।

হরিদাস—প্রভো, অনেকে শাস্ত্রমর্ম্ম না জানিয়া অযোগ্য হইলেও কৌলিক গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এক্ষণে উপায় কি?

গুরুদেব—ভাতের বদলে চাউল খাইলেই অজীর্ণতা জন্য কষ্ট অবশ্যই পাইতে হইবে, তবে ভাগ্যক্রমে পরিপাক শক্তি যাহাদের খুব প্রবল, তাহারা কোন রকমে হজম করিতে পারে, তবু কম পারে। আর যাহাদের জঠরাগ্নি মন্দীভূত, তাহারা বিষম মুস্কিলে পতিত হয়। অন্নদ্বারা শরীরপোষণ না হইয়া, তাহাদের কপালে শোষণ আরম্ভ হয়। বিপদ্ বুঝিয়া কেহ কেহ অন্তবিধ ঔষধের আশ্রয় লয়, আর যাহারা অলস, তাহারা বিসূচিকা, আমরক্ত বা অম্লশূল ইত্যাদি রোগে ভীষণ কষ্ট পায়। সরল বিশ্বাসের জোর থাকিলে, লৌকিক বিঘ্ন বাধা বিশেষ কিছু করিতে পারে না, কিন্তু

সেরূপ অটল বিশ্বাস আজকাল নিতান্ত বিরল। স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি জানিয়া যাঁহারা গুরুদেবের লৌকিক কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া খাঁটি হইয়া ধরিয়া থাকেন, দয়াময় শ্রীহরি তাঁহাদিগকে নিজেই রক্ষা করেন।

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্।
আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শরীরীদিগের অশুভ নাশ করতঃ স্বীয় গতি প্রদান করেন।

জীবমাত্রেই অপূর্ণ; অল্প হউক বিস্তর হউক, অপূর্ণতা সর্ব্বজীবেই থাকিবে। সুতরাং জীবকে পূর্ণস্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার লৌকিক ক্রিয়াকলাপ দুর্ব্বোধ্য লীলারহস্য ভাবিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাভারতে আছে—

গুরোর্ব্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ ক্রিয়াকর্ম্মবিলোকনাৎ।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি যদি ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং॥

গুরুর কদাপি না দেখিবে ক্রিয়া কর্ম্ম।
ক্রিয়াকর্ম্ম বিচারিলে নাশে নিজধর্ম্ম॥

হরিদাস—তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তাদৃশ ইষ্টদেবের সঙ্গ হইতে ইষ্টের সম্ভাবনা কোথা? বরং ঘোর অনিষ্টই সঙ্ঘটিত হয়।

গুরুদেব—সে কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাউল উদরস্থ করিলে ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। আমরা মায়িক জীব, আমাদের জীবন

সত্যাচরণ গঠিত হয়, কাজেই এরূপস্থলে তাদৃশ দীক্ষাগুরুকে "গুরুগোবিন্দম্ একপদ্ধম্" মনে ভাবনা করিয়া, অন্য পবিত্রাত্মা উন্নত মহাপুরুষের সঙ্গ লইতে হইবে।

হরিদাস—কিন্তু শুনিতে পাই, শাস্ত্রে নাকি কৌলিকগুরু ত্যাগ করা নিষেধ বলিয়া অনুশাসন আছে, তবে কি খাত-সলিলে ডুবে মরাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য?

গুরুদেব—মানবসমাজের অকল্যাণ হয় এমন কোন বিধান শাস্ত্রে স্থান পাইতে পারে না। "মন্ত্রত্যাগাৎ ভবেন্মৃত্যু, গুরুত্যাগাদ্ দরিদ্রতা"। এই বিধান সদ্‌গুরু সম্বন্ধে; অযোগ্য ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করিবার কোন আদেশ শাস্ত্রে থাকিতে পারে না।

শাস্ত্র কদাচ ন্যায় ও যুক্তির বহির্ভূত নহে। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত, নিত্য ও আত্মগত। বংশপরম্পরাগত উক্ত সম্বন্ধ চলিয়া আসিলে গুরুশিষ্যের মধ্যে পাকা প্রীতির সম্পর্ক হইয়া যায়, তাই কৌলিকগুরুর চরণাশ্রয় সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাই সাধারণ নিয়ম, গুরুলক্ষণ দ্বারা এই সাধারণ নিয়মকে বিশেষিত করিয়াছে অর্থাৎ অযোগ্যস্থলে উক্ত নিয়ম পালনীয় নহে। নচেৎ লক্ষণাদির কোন আবশ্যকতা থাকে না, মায়ের ভাই মামা, ইহা দৈহিক, লৌকিক সম্বন্ধ। ইহাতে অন্য কোন লক্ষণ দরকার হয় না। মহাপুরুষগণের জীবন দেখিলেই এবিষয় আরও বিশদ হইবে।

স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ৺গয়াধামে যাইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন, সেইস্থানে তাঁহার নিকটেই দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমঘনমূর্ত্তি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে আসিলেন। পশ্চিম গগনে নবমেঘ

দর্শন করিয়া তাঁহার সাত্ত্বিকবিকার উপস্থিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য এই অত্যদ্ভুত প্রেম-বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, সেইখানেই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। পরমভাগবত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে গদাধর পণ্ডিত দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে ঘোর বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দেখিয়া গদাধরের চিত্তবিকার জন্মিল, তিনি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে দেখিতে পাইলেন না, পরমুহূর্ত্তে বিদ্যানিধির প্রেমবিকার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইলেন। এবিষয়ে বেশী বিচার অনাবশ্যক। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ, বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর প্রভৃতি দেশাধিপতিরা বিস্তর বিচার ও গবেষণা করিয়া শেষে সুযোগ্য গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিদাস—বুঝিলাম, কিন্তু সুযোগ্য গুরু পাইতে অনেক বিলম্ব হইবে।

গুরুদেব—তাহার কোন কারণ নাই, শ্রীভগবানে মন বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারিলে তিনি ঠিক্ উপযুক্ত সময়ে বস্তু মিলাইয়া দিবেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে সাধুসজ্জনের কখনও অভাব নাই, বিশেষতঃ জীবোদ্ধারের জন্য কলিযুগাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পার্ষদগণও মহাশক্তিসম্পন্ন সাধনশৈলের অত্যুচ্চ স্থানে উন্নীত "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহারা অনেকেই গৃহী সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততি ও শিষ্যানুশিষ্যের মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে; কালধর্ম্ম

গুরু কামিনীকাঞ্চনের সম্বন্ধ কোন কোন স্থলে ঐ নিহিতশক্তি অবশ্য লুপ্তপ্রায় দেখা যায়, কিন্তু তবু যোগ্যপাত্র একেবারে বিরল হয় নাই। এইরূপ আভিজাত্যসম্পন্ন সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ভাগ্যে ঘটিলে শ্রদ্ধাও সত্বর দৃঢ়ীভূত হয়। সব শিলাতেই শ্রীভগবানের সত্তা আছে, তবে শালগ্রাম শিলাতেই প্রকাশাধিক্য।

শিক্ষাগুরু।

হরিদাস—আজকাল আমাদের সমাজের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অন্য কর্ম ত্যাগ করিয়া, কোন সাধুমহাজনের চেলা হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফেরা বা একচিত্ত হইয়া গুরুসমীপে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

গুরুদেব—বুঝিয়াছি, ধনোপার্জ্জন আজকাল একটা নিতান্ত উপরি কাজ হইয়াছে। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় এবং কতকগুলি বিলাস-দ্রব্য এক্ষণে সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ায়, সংসারের খরচ নির্ব্বাহ এরূপ দুষ্কর হইয়াছে যে, গৃহীকে অনুক্ষণ অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকিতে হয়, তার উপরে আর অন্য চিন্তা করিবার উৎসাহ থাকে না। স্থূলদেহের পরিচর্য্যায় জনম কাটিতেছে, আত্মার কল্যাণ ভাবিবার সময় হয় না, ইহা নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা, ইহাই আত্মার মৃত্যু।

হরিদাস—ইহার উপায় কি আছে? আমরা "জেনে শুনে অবু ভুলে আছি"—জীবন বৃথাই নষ্ট হইতেছে!

গুরুদেব—শক্ত সমস্যাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আসল কাজে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; যাহারা পারিবে, তাহারা বিষয়ের মোহে মুগ্ধ না হইয়া ধর্ম্মকেই জীবনের মুখ্য কার্য্য করিবে। আর যাহারা পারিবে না, তাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম মিলাইয়া চলিবে, "যুক্ত বৈরাগ্য" মহাপ্রভুরই অভিমত। সমগ্র জগজ্জীব সন্ন্যাসী বৈরাগী সাজিয়া বেড়াইতে থাকুক, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছা নহে। বিষয়ের সহিত অনাসক্তভাবে যুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। তাই সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শেষে শ্রীসনাতনকে বলিলেন—

"যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সবে নিষেধিল॥"

হরিদাস—কিন্তু সংসারমধ্যে প্রকৃত পথপ্রদর্শক শিক্ষক সর্ব্বদা পাওয়া যায় কই?

গুরুদেব—সে চিন্তা তোমার করিতে হইবে না, তোমার প্রকৃত পিপাসা হইলে তিনিই জল আনিয়া দিবেন।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতম্॥

সত্যধর্ম্ম জানিবার জন্য যাঁহারা সুদৃঢ়ব্রত, অবিলম্বেই তাঁহাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। মূলবস্তু নির্ব্বন্ধিনী মতি তাহা মিলিলে অন্য কিছুরই অভাব হয় না। দীক্ষাগুরুকে নিকটে পাইবার

সুবিধা না হয়, শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় করিবে, তাহা সর্ব্বদাই প্রাপ্তব্য।

হরিদাস—শিক্ষাগুরুর লক্ষণ কি?

গুরুদেব—যাঁহার নিকট হইতে ভগবত্তত্ত্ব শিক্ষা করা যাইতে পারে তিনিই শিক্ষাগুরু, আর স্বয়ং ভগবানই শিক্ষাগুরু। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ।"

ফলকথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিক্ষা দেন, হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সাধকহৃদয়ে প্রেরণ করেন, ইহাই প্রেরণা বা Inspiration। অথবা এরূপ বুদ্ধিযোগ ঘটাইয়া দেন যাহাতে সাধকের সর্ব্বতত্ত্বের বিকাশ হয়—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

গীতা।

আমাতে সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকেই ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

জ্ঞানভক্তির জীবন্তমূর্ত্তি শ্রীল অদ্বৈত প্রভু গীতাপাঠকালে কোন কোন শ্লোকের নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করিতে না পারিয়া,

দুঃখিতান্তকরণে অনশনে নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীভগবানের কৃপার দিকে তাকাইয়া পড়িয়া থাকিতেন, অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ অনতি-বিলম্বে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিতেন। মহাপ্রকাশ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদ্বিবরণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে নিজেই বলিয়াছিলেন—

"যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্বভোগ॥
দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ॥
শুন শুন আচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন, কে তাঁহাকে নিখিল-শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব শিখাইল? আবার আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনও বলিতেন, "ভগবত্তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য। প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিলে তবে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়"।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

অন্য প্রকার শিক্ষাগুরু সাধু ভাগবত; যাঁহার জীবনানুকরণে বা উপদেশাদি পাইয়া তুমি কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। বৎস, পূর্ব্বে বলিয়াছি সঙ্গই মূলবস্তু, সঙ্গ হইতে স্বর্গ, সঙ্গ হইতেই নরক। তোমার মন সঙ্গ-লিপ্সু,

তুমি সৎসঙ্গ জুটাইয়া দিতে না পারিলে, সে তৎক্ষণাৎ অসৎসঙ্গে মিশিবে। তাহা চারিদিকে যথেষ্টই রহিয়াছে। তখন ভোগ-সুখের আপাতমধুর পরিণাম বিষময় ফল খাওয়াইয়া তোমাকে অলক্ষ্যে ক্রমশঃ বাঁধিয়া ফেলিবে, তুমি তখন বন্দী হইয়া পড়িবে। জগতে সঙ্গ দুই প্রকার—ভগবান্ সত্যস্বরূপ, সেই সত্যের সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলে, আর মায়া (ভেল্কী) অসৎ, অনিত্য সুতরাং মায়ার সঙ্গকে অসৎসঙ্গ কহে। প্রথমটী আপাততঃ কঠোর, কিন্তু পরিণামে সুখাবহ ও আনন্দদায়ক, দ্বিতীয়টী আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে বিষময়, মহারৌরব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

তভো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে আসক্ত হইবেন, যেহেতু সাধুগণ উপদেশদ্বারা মনের ভক্তিপ্রতিবন্ধকারিণী বাসনাকে নষ্ট করিয়া দেন।

হরিদাস—এই পরমহিতৈষী সাধুভাগবত সকল সময় মিলে কই ?

গুরুদেব—সর্ব্বদাই মিলে, তুমি চাহিলেই মিলে। ভাগবত দুইপ্রকার—

"এক ভাগবত বড়, ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তি-রসপাত্র॥"

যখন সাধুভক্তের সঙ্গ না মিলিবে, তখন তুমি ভক্তিশাস্ত্রের সঙ্গ কর, ভগবৎ-কথামৃত অতি উপাদেয় এবং চিত্তপরিশোধক।

তাহাতে আরও নিবিষ্টমনে সাধুমহাপুরুষের সঙ্গ করা হয়। ভক্ত-জীবনলীলা ও ভক্তিসাধনতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে আনন্দে মন তাহাতেই আকৃষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনও পরি-মার্জ্জিত হইতে থাকিবে। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে অনূ্যন পক্ষে পূর্ণ এক বৎসর গুরুগৃহে বাস ও গুরুসেবাদি করিবার ব্যবস্থা আছে, যে ভাগ্যবান্ পারিবেন তিনি তাহাই করিবেন। আর যাঁহারা পারিবেন না, তাঁহারা যেরূপেই হউক, সাধুসঙ্গ ও শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা আত্মশোধন করিবেন। ক্ষেত্র উপযুক্তরূপ কর্ষিত না হইলে, বীজ বপন করিলে তাহা সুফলপ্রদ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

হরিদাস—প্রভো, শ্রীভগবত্তত্ত্ব কিছু শুনিবার বাসনা হইতেছে, কৃপা করিয়া বর্ণন করুন।

গুরুদেব—হরিদাস, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্ অবাঙ্মনস-গোচর—জীবে তাঁহাকে কি বুঝিবে? তবে তাঁহার বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত মহাজনেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আইস তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। যে সিদ্ধান্তপুস্তক পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমানন্দে অধীর হইয়াছিলেন, যাহা সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দাক্ষিণাত্য হইতে নিজে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-

সংহিতার আদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভক্ত অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামী তাহার বিচার করিয়াছেন, আইস তাঁহার চরণধুলি লইয়া আমরা সংক্ষেপে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। মহারত্ন পাইলে দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, প্রেমাবতার মহাপ্রভুর উক্ত পুঁথি পাইয়া তদপেক্ষা আনন্দ হইয়াছিল।

পুঁথি পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাই ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥

বুঝিলে? ব্রহ্মসংহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আর নাই এবং শ্রীজীবগোস্বামী অপেক্ষা যোগ্যতর মীমাংসকও আর জন্মে নাই। সুতরাং ইহার উপর সুদৃঢ় আস্থা করিতে পার।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

ব্রহ্মসংহিতা ১।১।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

শ্রীচরিতামৃত।

বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ এই, তাঁহাকে কেবল ভারতের খণ্ডরাজ্য দ্বারকার অধিপতি ভাবিলে অথবা অর্জ্জুনসারথি ভাবিলে চলিবে না, তিনি কি বস্তু বুঝ—

কৃষ্ণ (কৃষ+ণ) "কৃষি র্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক সুতরাং সৎ, ণ=নিবৃত্তি=উপসর্গরাহিত্য=আনন্দ; যিনি সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পরমব্রহ্ম। সদানন্দযুক্ত হইলে "চিৎ" আপনিই জন্মে।

সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাৎ চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে।

বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র।

কৃষ্ ধাতুর অন্য অর্থ আকর্ষণ, তাহাতেও বুঝা যায় যিনি সর্ব্বাকর্ষক।

"পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥"

পরম ঈশ্বর—সর্ব্বেশ্বর, সকলের প্রভু ও কর্ত্তা।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—তাঁহার প্রাকৃত কোন মূর্ত্তি নাই, তবে তিনি অপ্রাকৃত ও ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি।

অনাদিরাদি—নিজে অনাদি অথচ সকলের আদি।

গোবিন্দ—জগৎপালক।

সর্ব্বকারণ কারণ—এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মূলকারণ প্রকৃতি, সেই মূলপ্রকৃতিরও যিনি কারণ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রুতি-কথিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তিনি। যিনি অণু হইতে অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ, সেই পরমবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এক, বশী (বশে আনিতে সমর্থ) সর্ব্বগ ও স্তবনীয়—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গোপালতাপনী শ্রুতি)।

হরিদাস—আমাদিগকে তবে সাহেবেরা বহুদেবোপাসক ও মূর্ত্তিপূজক ব'লিয়া ঘৃণা করে কি জন্য?

গুরুদেব—গায়ের জোরে ঘৃণা করিলে তুমি কি করিবে? তোমাকে মানুষ না ব'লে যদি ভূত বলে, তাতেই বা তুমি কি করিতেছ? সাহেবেরা বিজাতীয়, তা'দের কথা তবু গায়ে সয়, কিন্তু তোমরা যে কিছু না দেখে শুনে যা' তা' বল, তাহাই বিশেষ দুঃখের কথা।

হরিদাস—আচ্ছা তবে ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি বহু দেবতার উদ্ভব হইল কি জন্য?

গুরুদেব—ব্যস্ত হইও না, ক্রমে আলোচিত হইতেছে। উহা দুই রকমে হইয়াছে, (১) একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম; (২) নাম বহু হইলেও বস্তু মূলতঃ একই বটে, তোমাকে আমি 'হরিদাস' বলি, তোমার পিতামাতা খাঁদু বলেন, মামার বাড়ীতে কানাই বলে, তাই ব'লে কি তুমি তিনটী পৃথক্ বস্তু হইবে? পৃথক্ পরিচ্ছদ পরিতে পার, সেজন্য তোমাকে পৃথক্রূপ দেখাইলেও তুমি একই বস্তু—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

লঘুভাগবতামৃত।

একই মণি বর্ণভেদে নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত নাম হইয়াছে, সেইরূপ একই অচ্যুত ভক্তের ধ্যান-অনুসারে বিভিন্ন নাম ও রূপ হইয়াছে।

হরিদাস—তবে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি মধ্যে এত ঝগড়া কিজন্য?

গুরুদেব—না বুঝিলেই ঝগড়া ও অপরাধ। পরমোদার শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসী লক্ষ্মীনারায়ণসেবী ভট্টকে বুঝাইলেন—

কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপীলক্ষ্মী ভেদ নাই হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥

সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত লক্ষণান্বিত বস্তুকে আমি শ্রীকৃষ্ণ বলি, তুমি যদি ঠিক সেই বস্তুকেই শিব বল, সাহেবেরা যদি তাহাকেই গড্ (God) বলে, তবে আমাদের আর বিরোধ কিসে? নাম বিভিন্ন, কিন্তু ধারণা এক, বস্তু এক।* প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিবদর্শনে হউক বা কালীদর্শনে হউক প্রেমবিহ্বল হইতেন।

---

* তত্ত্বগত এক হইলেও নামনামির অভেদত্ব থাকেনা ও কৃষ্ণনামের যোগরূঢ়িবৃত্তি রক্ষিত হয় না।

হরিদাস—কেহ কেহ বলেন শিব তমোগুণাত্মক, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত এক হইতে পারে না।

গুরুদেব—ইহাও সত্য বটে; ইহাই দ্বিতীয় প্রকার। গুণ-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন নাম হইয়াছে, অথবা মূলাধার শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যাশক্তিবলে বিভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন নাম ধরিয়া আছেন। বৈষ্ণবেরা বহুতত্ত্ব আলোচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর পূর্ণানন্দ মায়াধীশ ব্রজেন্দ্রনন্দন করিয়া ও সর্ব্বোপরি বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি বিবিধ কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বা অংশাবতার দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং যে শিব সংহারের কর্ত্তা তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মাত্র, পূর্ণব্রহ্ম নহেন, কাজেই পার্থক্য।

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

মাধুর্য্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয়, অন্য স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং পূর্ণতম। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ মাধুর্য্যসার অন্য সিদ্ধি নাই তার
তেঁহো মাধুর্য্যের গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, *যার দত্ত গুণভাসে
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥

* প্রকাশ অর্থাৎ শিবপ্রভৃতি স্বরূপে।

যদি দুগ্ধের বিকার হইলেও দধিকে ঠিক্ দুগ্ধ বলিয়া তর্ক করা বাতুলের কার্য্য।

> অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
> স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥

বেদের একেশ্বরবাদই অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ তাহাকে বিশেষিত করিয়া আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামী পাদ বলেন, তাঁহার সদৃশ বা সমান, অন্যবস্তু নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু বটেন, কিন্তু অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত আছেন, ইহাই রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা।

হরিদাস—ঠিক্ বুঝিলাম না, "একমেবাদ্বিতীয়ং" আবার দুইটী হইলেন কিরূপে?

গুরুদেব—তেঁতুলের বীচি একটী বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে গেলেই দেখিবে দুইটীতে মিলিত হইয়া এক হইয়া আছে; ইহাই বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ। (অপ্রাকৃত রূপ গুণাদিবিশিষ্ট হইয়াও তিনি এক)।

> মৃগমদ তৈছে গন্ধ নাহি কোন ভেদ।
> অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহিক প্রভেদ॥

অগ্নি হইতে জ্বালাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ইহাকেই বলে "অচিন্ত্যভেদাভেদ"। শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ প্রতীতিও চিন্তার অতীত, উভয়ের একত্ব জ্ঞানও চিন্তার অতীত। শক্তি শক্তিমানের লীলা, প্রকৃতি পুরুষের খেলা।

> একাত্মনো হি তনোর্ভেদে দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা॥

দুগ্ধ ও ধবলতার ন্যায় রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়াও বিভিন্নবপু।

সৃষ্টিলীলার অভ্যন্তরে ঈশ্বরতত্ত্ব অতি নিভৃতভাবে নিহিত রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে শক্তিকেই দেখিতে পাই, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে তখন শক্তিমানের সহিত দেখা হয়, তিনিই বীজস্বরূপ "তেজস্তেজস্বিনামহম্"। আর দেখিতে পাই মহামিলন ও মহাবিচ্ছেদের অবিশ্রান্ত লড়াই। সমগ্র সৃষ্টি ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত। অসৎ, সদসৎ ও সৎ, ইহাকে শাস্ত্রে মায়াশক্তি, জীবশক্তি ও চিচ্ছক্তি অথবা বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা শক্তি বলে।

অনন্ত শক্তি কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি নাম॥

শ্রীচরিতামৃত।

চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপিণী স্বরূপশক্তি, ইহার নাম যোগমায়া "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি" (শ্রীচরিতামৃত) এই শক্তি জীবকে কেন, জগতের সমস্ত বস্তুকেই অবিরাম সেই মহাচৈতন্যের দিকে টানিতেছেন। শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের যোগ করিয়া দেওয়াই যোগমায়ার কার্য্য, ইনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন করাইয়া দিতেছেন, তাই এই শক্তির নাম অন্তরঙ্গা শক্তি।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, মায়া জীবকে কেন? সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকেই সেই শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে অতিদূরে লইয়া যাইতেছে। জীবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার ধর্ম্ম। অসৎকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে বলিয়াই ইহার নাম দর্শনে অবিদ্যা, পুরাণে মায়া (ত্রিগুণী) বা জগৎ-প্রসূতি প্রকৃতি।

অনাত্মনি দেহেন্দ্রিয়াদৌ আত্মধীরবিদ্যা।

(যোগসূত্রম্)।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।

(সাংখ্য প্রবচনং)।

জীবশক্তি তটস্থা, অর্থাৎ স্থল ও জলের সীমান্তে, আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থলে, চিৎ ও জড়ের সম্মিলনস্থানে অবস্থিত। বিশুদ্ধাত্মাই জড়দেহাচ্ছন্ন হইয়া জীবোপাধি ধরিয়াছে, (যেমন জবাকুসুমাদি সন্নিহিত রক্তাভ স্বচ্ছ স্ফটিকমণি)। সন্ধিস্থানে পড়িয়াছে, তাই জীবের ইন্দ্রিয়োপহিত শক্তিবিশেষের মহা-সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, কারণ উপরে পরমাত্মা মধ্যে ইন্দ্রিয়, নীচে বিষয় বাসনা। উভয়াকৃষ্ট ঘোটকের মত নিম্ন দিশাপন্ন। যে দিকে জোর বেশী হইবে সেইদিকেই আকৃষ্ট হইবে। একদিকে অত্যুচ্চ উৎকর্ষ স্থান অন্যদিকে অতলস্পর্শী রসাতল, একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর, অন্যদিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর হিমাদ্রি গহ্বর। বুদ্ধির একটুকু বিপর্য্যয় হইলেই জীব ভগ্নপৃষ্ঠ হইবে।

হরিদাস—জীবের স্বরূপ লক্ষণ কি ?

গুরুদেব—"জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান। দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান"। (শ্রীচরিতামৃত)।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; ভগবৎকথা পালন, ভগবৎসেবাই জীবের নিত্যধর্ম। সেবাবুদ্ধি থাকিতে জীবকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু মায়াবিকৃত মনের তাড়নায় কখনো পড়িলে জীব নিত্যস্বরূপ "দাস্য" ভুলিয়া নিজে আত্মসুখে ভোগলিপ্সু হইয়া পড়ে,

যাহাই সর্ব্বানন্দের হেতু হয়। দাসের পৃথক্ কোন স্বতন্ত্রতা নাই, সুতরাং আত্মসুখ দাসের থাকিতে পারে না। দাস সর্ব্বথা প্রভু-পরতন্ত্র, প্রভুর সেবাকার্য্যে দাস আত্মবিক্রয় করিয়াছে; তাহার নিজের স্বত্বস্বামিত্ব প্রভুতেই মিশাইয়া ফেলিয়াছে। দাস স্বসুখ-কামনাগন্ধবিহীন। "অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্বকর্ম্ম"। ভালমন্দ বিচারেও দাসের অধিকার নাই, দাস আদেশপালী যন্ত্র-স্বরূপ। প্রভুর ধর্ম্ম ভোগ, আর দাসের ধর্ম্ম সেবা। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রভু সেবা। তাই "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা জীবের স্বধর্ম্ম", আর "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা জীবের অধর্ম্ম"। যতদিন এই আত্মসুখ-ভোগরূপ পাপব্যাধি জীবহৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিবে, ততদিন জীব অক্ষয়। দাস হইলেও দাস তখন মুক্ত, সিংহের ন্যায় তেজস্বী। সময়ে স্বয়ং প্রভুই দাসের অধীন হন।

অন্য কেন না মানিছ কৃষ্ণদাস নাম।
অন্য ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
সেবক কৃষ্ণের পিতামাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপে চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

হরিদাস—পূর্ব্বে বলিয়াছেন জীব তটস্থা, আলোক অন্ধকারের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, জীব তবে আলোকে না গিয়া অন্ধকারে অধিক আইসে কিরূপে ?

গুরুদেব—শাস্ত্র বলিতেছেন জীব দুই প্রকার, "এক নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। অন্যটি নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ"। ইহাই প্রভুর খেলা। তটস্থা জীবের সম্মুখে দুইটী পথ—একটী কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ইহাই প্রেমের পথ। অন্যটী আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ইহাই কামের পথ। এই প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা ছাড়িয়া জীবের মন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। মহাসমুদ্রবৎ জীবহৃদয় সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত ও অশান্ত। এই কামনা কোথা হইতে আইসে? "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"। সঙ্গ হইতেই কামনার সৃষ্টি। প্রাকৃতবিষয়ের সঙ্গ হইতে কামের উৎপত্তি, আর অপ্রাকৃত বস্তুসঙ্গজন্য প্রেমের উদয় হয়। অপ্রাকৃত কামনায় মন ডুবিয়া থাকিলে প্রাকৃত কাম আর তথায় প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। সংস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্যের নিকটে অসৎ-মায়ান্ধকার কিরূপে যাইবে?

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

এই প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ আনন্দাকাঙ্ক্ষাই জীবের মূল আকর্ষণ বা নিয়ামক। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" ইতি শ্রুতিঃ। সেই আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দলিপ্সু জীব তাই আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়।

ওঁ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি। ইতি শ্রুতিঃ

আনন্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, আনন্দের দ্বারা সঞ্জীবিত, আবার আনন্দস্বরূপেই প্রত্যাগত ও অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। এই চিত্তত্ত্ব আনন্দ অপ্রাকৃত, ইহা দ্বিবিধ, ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ এবং ঐশ্বরিক অর্থাৎ সেবানন্দ। ঐ অপ্রাকৃত আনন্দের অতি হেয় প্রতিফলনে উদ্ভূত যে আনন্দাভাস, তাহার নাম প্রাকৃত বৈষয়িক আনন্দ। প্রথম প্রকার, ত্যাগ ও শুদ্ধা ভক্তি হইতে সঞ্জাত, উহা দেখিতে আপাত কষ্টকর হইলেও পরিণাম অতি সুখকর। আর দ্বিতীয় প্রকার, ভোগ অর্থাৎ আত্মসুখ হইতে সঞ্জাত, তাহা আপাতমধুর হইলেও পরিণাম বিষময়। লীলাময়ের ইচ্ছাই লীলা। তাই আনন্দাস্বাদনের জন্য তিনি স্থাবর জঙ্গম স্থূল সূক্ষ্মাদি বহু মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আছেন।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

শ্রীচরিতামৃত।

এই পরিদৃশ্যমান্ প্রাকৃত জগতের নাম "দেবীধাম", ইহা মায়াদেবীর অধিকৃত রাজ্য, এখানকার সমস্ত বস্তু মায়াবিজৃম্ভিত জগৎ; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জীব মায়ারাজ্যের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে। অসদ্বস্তুর সঙ্গ আপাতমধুর অতিসুমিষ্ট। স্বাস্থ্যকর অমৃতোপম "গোবিন্দভোগ"সন্দেশ প্রয়াসী জীব, অতিজঘন্য ব্যাধিকর, পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক, আপাতমিষ্ট চিনির ঢেলা লইয়াই চাটিতে আরম্ভ করিয়া বিষয়সুখে নিমজ্জিত হইয়াছে। কাম (আত্মসুখ) হইতে লোভের উৎপত্তি, লোভে মোহ আনয়ন করে, তখন চৈতন্য লুপ্ত হয়, অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান হয়, দেহে আত্মবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সুতরাং জীব আত্মস্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাস হইয়া পড়ে।

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞান-আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

আমি জীব, ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিভূতি। "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ"। ব্রহ্মের অনন্তগুণের কণিকা জীবেও বিন্দুবিন্দু মাত্রায় নিহিত রহিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শুষ্কতৃণ মধ্যে যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনই সদ্গুণে জীবের কোন কোন গুণের আধিক্য হইয়াছে।

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

স্বতন্ত্রতা শ্রীভগবানের প্রধান একটী গুণ, জীবেতেও তাহার বীজ রহিয়াছে। জড়দেহাচ্ছন্ন হইয়া মায়ারাজ্যে প্রাকৃত বিষয় সঙ্গমধ্যে পড়িয়া জীবের স্বতন্ত্রতা ক্রমে জাগিয়া উঠে। মাতৃগর্ভে জীব পূর্ণমাত্রায় পরতন্ত্র, শৈশবেও প্রায় তাই, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃত সম্বন্ধে জীবের স্বতন্ত্রতা বাড়িতে থাকিল; তখন শিশু চপল হইল, বালক অবাধ্য হইল, ষোড়শবর্ষে যুবক সাবালক হইল। তখন পিতা কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া পুত্রের মিত্র হইলেন, হয় ত পুত্র আরও পাকিয়া গিয়া পিতার সহিত অবজ্ঞা আচরণ আরম্ভ করিল; জীব আর তখন দাস নহে, জীব তখন পাকা কর্ত্তা।

হরিদাস—এই প্রাকৃত কথাটী ঠিক বুঝিলাম না।

গুরুদেব—প্রাকৃত শব্দ প্রকৃতি হইতে সিদ্ধ, এই প্রকৃতিকে আপনারা জড়প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের দুইটী রাজ্য লইয়া আমাদের কারবার। একটী প্রাকৃত রাজ্য, অপরটী অপ্রাকৃত রাজ্য।

অপ্রাকৃতের পৃথক্ কোন সূত্র নাই, যাহা প্রাকৃত নহে তাহাই অপ্রাকৃত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়ং…….. ………… (গীতা ৭। ৪)।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী অপরা প্রকৃতি। ইহাদের বিকারে বা সংশ্রবে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ "স্থাবরা জঙ্গমা শ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং"। এই রাজ্যের পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই অসৎ, জড়ীয় মায়াসৃষ্ট, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর যাহা প্রাকৃত রাজ্যের অতীত, অথচ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, চিন্ময়, নিত্যানন্দ তাহাই অপ্রাকৃত। চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং" ইহা মায়ারাজ্যের অতীত পরব্যোম গোলোক বৃন্দাবন। বৃন্দাবনবর্ণনসময়ে কবিরাজগোস্বামী তাই বলিয়াছেন "বৃন্দাবন বিভু"।

এই বৃন্দাবন সর্ব্বত্র বিরাজিত, তবে মায়িক দৃষ্টির অতীত। পরম কৃপাময় লীলা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় সেই দিব্য প্রপঞ্চাতীত চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবনকে প্রপঞ্চান্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে প্রকট করিয়াছেন।

হরিদাস—দুর্ব্বল জীবকে প্রাকৃতরাজ্যে মায়ার হাতে ফেলাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ঘুরাইয়া তাঁহার কি আনন্দ বাড়িতেছে?

শুকদেব—উহাতেও আনন্দের বিবিধ বিবর্ত্ত চলিতেছে, বিরহ না হইলে প্রেমের পুষ্টি হয় না। স্বামী দীর্ঘপ্রবাসী না হইলে

কালিদাসের অতিমধুর মেঘদূত হইত না। সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা না হইলে বা তাঁহার উদ্ধারকল্পে অসাধ্যসাধন করিতে না হইলে, সুদীর্ঘ বিরহের পর রামসীতার যুগলমিলন অত মধুর হইত না, এবং পরমভক্ত রামদাস হনুমানের অত আনন্দ হইত না। সমুদ্রসেচনসিঞ্চিত মহারত্ন বলিয়াই কৌস্তুভ ভগবদ্বক্ষে স্থান পাইয়াছে। এইখানেই প্রকটলীলার বিশিষ্টতা। বিঘ্ন বাধা মধুরমিলনকে আরও মধুর করে। জটিলা কুটিলা না থাকিলে প্রেমময়ী রাধারাণীর প্রেমমহিমার সম্যক্ বিকাশ হইত না। কৃষ্ণদ্বেষিণীরা অনুক্ষণ অনুরাগিণীকে ঘেরিয়া আছে, ওদিকে অবুঝ শ্যামের বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাঁশী সময়াসময় স্থানাস্থান মানে না, দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে, অবলা সরলাকে উন্মনা করিল, গৃহকর্ম্ম আর ভাল লাগিতেছে না, ক্রমে আকুল করিল, তখন বঁধুসঙ্গে মিলিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন, তৎপরে 'বাউরী'(পাগলিনী) করিয়া তুলিল, আর ধৈর্য্য থাকিতেছে না, মনে হইতেছে "না হয় ত্যজি কুলে, যাই যে বনে মুরলী বাজে", সম্মুখে বিশাখার পাইয়া ধনী খেদ করিতেছেন—

"শ্যামের বাঁশিটী, দুপুরে ডাকাতি, সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, কেন বা এমতি হৈল॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী, মানয়ে যেমন দাসী॥"

গুরুগঞ্জন, ধরম-সরম, কুলশীল লাজভয় সকলেই কৃষ্ণমিলনের মহাবৈরী। শ্রীমতীর প্রেমে-গরগর মনকে উহারা বড়

চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছে, পদ্মার বাণের মত কানু-অনুরাগ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে,, ক্রমে তাহা কুল, শীল, লাজ,ভয় ডুবাইয়া গুরু-গঞ্জনাকে ভাসাইয়া প্রেমময়ীর পাগল মনকে লইয়া কুঞ্জের দিকে ছুটিল; তখন অবলা সবলা হইলেন, অনুরাগিণী দৃঢ়ব্রতা হইলেন, স্থির করিলেন, সব যায় যাক্ তবু বঁধু ছাড়িতে পারিব না—

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ্ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ভয়।
না বলুক না ডাকুক না যাব কার ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥
কালো মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

ইহাই পরকীয়া রসের চিত্র, স্বকীয়াতে এই সমস্ত বাধা নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের এই অপূর্ব্ব বিবর্ত্তও নাই। ইহাই প্রেমের মধুরতম চিত্র, কৃষ্ণপ্রাণ-ব্রজবাসী ভিন্ন এই লীলায় অন্যের অধিকার নাই।

পরকীয়া রসে হয় অধিক উল্লাস।
ব্রজবিনে ইহার অন্যত্র নহে বাস॥

পরকীয়ার নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছ কি জন্য? আমাদের সম্বন্ধ ভাব লইয়া, বস্তুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

আনন্দাভিনয়ের এত অপূর্ব্ব চিত্র দ্বাপরযুগে বৃন্দাবনে অভিনীত হইয়াছিল, উদ্দেশ্য জীবশিক্ষা। মায়ার চক্রে জীব সংসারের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ, সংসারের অসংখ্য জঞ্জাল ও কুটিল ব্যবহার জীবকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া আছে, পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে দিতেছে না। ভগবানের চিচ্ছক্তি যোগমায়া, শ্যামের মোহনমুরলী রবের ন্যায় মুগ্ধ জীবকে ক্ষণে ক্ষণে চকিত করিতেছে। বিষয়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে প্রথমে "দগ্দগি" আরম্ভ হইল, ক্রমে "পরাণ-পোড়নি" ধরিল, তারপরে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল, তখন ভক্ত সংসারসুখভোগকে পদাঘাত করিয়া, প্রাণবঁধুর সন্ধানে মধুর বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন, মায়ার শতগুণের বন্ধন মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল, যোগমায়া জয়যুক্ত হইলেন। তাই লীলারহস্য বুঝাইতে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥"

ভোগত্যাগ ও চরিত্র গঠন।

হরিদাস—আবার যে সেই "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" আসিল!

গুরুদেব—হাঁ বিশুদ্ধ সত্ত্বই ধর্ম্মের মূলভিত্তি, তাহা না হইলেই চলিতে পারে না। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং"।

বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব, সেইখানেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—Purity (পবিত্রতা) is absolutely the basic work of Bhakti building। জীবহৃদয় অসৎসঙ্গ জন্য আত্মসুখপরতন্ত্র হওয়ায় পূতিগন্ধযুক্ত হইয়াছে, তাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সাধুসঙ্গাশ্রয় দ্বারা উহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত করিতে হইবে, তবেই উহা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসকুঞ্জ হইবে।

হরিদাস—অসৎসঙ্গ বলিতে প্রধানতঃ আমরা কি বুঝিব?

গুরুদেব—কামিনী কাঞ্চন প্রধান অসৎ, কামিনীতে আসক্ত, ও বিষয়াসক্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিষিদ্ধ।

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।"

কেহ কেহ বলেন বিবাহিতা স্ত্রীসঙ্গ দূষণীয় নহে। অনাসক্তভাবে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ শাস্ত্রসম্মত বটে। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় না হইয়া বরং সহায় হয়েন, তাদৃশী স্ত্রী দূষণীয়কামিনীপদবাচ্যা নহেন, তিনি সহধর্ম্মিণী, সেরূপ দেবীসঙ্গ বরং সাধনার অনুকূল। তাহাতে বরং একের পৃষ্ঠে শূন্য মিলিয়া এককে দশ করিয়া তুলে। সেইজন্য মহাপ্রকাশসময়ে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ও শ্রীবাসকে সস্ত্রীক ইষ্টদর্শনের আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসক্তির হাত এড়ান সহজ নহে, তাহাই বন্ধের কারণ। শাস্ত্র এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন, অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করিয়াও তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।

হরিদাস—প্রভো, এমন অনেক বৈষ্ণব দেখা যায়, যাঁহারা বেশ মালাতিলকাদি ধারণ করেন, মহাপ্রভুর নামও করেন, ভাগবতাদিও পাঠ করেন কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত, কৃষ্ণলীলার দোহাই দিয়া, অনেক ঘৃণ্যকর্ম করিয়া তাঁহারা সমাজকে কলুষিত করিতেছেন।

শুকদেব—সেই ভ্রষ্টাচারিরা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের কলঙ্ক, ঐ চরিত্রহীন ব্যক্তিরা পবিত্র বৈষ্ণব চিহ্নাদি ধারণ করেন বলিয়াই অনেকেই আজকাল মালাতিলকাদির প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। উচিত কথা বলিতে হইলে কিছু কর্কশ বলিতে হয়, মুখে মহাপ্রভুর অনুগত বলেন কিন্তু কার্য্যে তাঁহার মূল আদেশ প্রতিপালনেই উদাসীন। তাঁহাদের অযথা ব্যবহার দর্শনে অনেকেই পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া দূর হইতেই সরিয়া পড়িতেছেন।

হরিদাস—সেইজন্য অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করেন, তবে আজকাল মহাপ্রভুর অত্যুদার সুবিমল চরিতামৃতে আকৃষ্ট হইয়া, অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা এই পথে আসিতেছেন।

শুকদেব—বৈষ্ণব নামধারী একজন চরিত্রহীন কপটাচারীকে আদর্শ ধরিয়া, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচার করা সমীচীন নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের ও তদীয় পারিষদবর্গের পরম পবিত্র চরিত্রাস্বাদন করুন, তাঁহাদের অনুমোদিত গ্রন্থাদি পাঠ করুন, দেখিতে পাই-বেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম কি মহান্, পবিত্র, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও পূর্ণ আত্মত্যাগের ধর্ম্ম। আমরা সকলরী কৃতবাদে শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা একটু আলোচনা করিয়া দেখুন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যজগতেই কতকাস্থানিক পরস্পর্ধাত্মক কহিয়াছেন

নিজস্বরূপ প্রকাশ পাইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম অত্যুচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব ও অতিদুর্ব্বোধ্য বিজ্ঞানরহস্যসমন্বিত। যে ধর্ম্ম বিদ্বৎ-শিরোমণি ন্যায়াচার্য্য সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের ও সরস্বতীর বরপুত্র মহাদার্শনিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দের ধর্ম্ম হইয়াছিল, তাহা কি কখন বর্ণজ্ঞানবিরহিত অমার্জ্জিতবুদ্ধি কুক্রিয়াসক্ত নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম হইতে পারে? যে ধর্ম্মের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের নিকট বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদা তৃণবৎ ভাসিয়া গেল, অতুল ভোগবিলাস শুষ্কপত্রের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া গেল, দবীরখাস শতগ্রন্থি কন্থা লইয়া বৃক্ষতলবাসী হইলেন ও জগজ্জীবের কল্যাণজন্য নিখিল শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিলেন, সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপ্রাণ বৈষ্ণব রূপসনাতন যে ধর্ম্মের আদর্শ, তাহা কি কখন কামিনীকাঞ্চনলোলুপ বিষয়বিষ্ঠাকীট নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম হইতে পারে? মহেন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য অপ্সরাসদৃশী পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া যে অপূর্ব্ব প্রেমের ধর্ম্মপালনায় রাজপুত্র দীনহীন ভিখারী সাজিয়া পরিত্যক্ত গলিতান্নদ্বারা জীবনরক্ষা করিতেছেন, আর অতি দীনভাবে জগন্নাথ-মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া অহর্নিশি মধুর হরিনাম বিতরণ করিতেছেন, ভোগত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি, মহাবৈরাগী রঘুনাথদাস যে ধর্ম্মসাধনের পথপ্রদর্শক, সেই মহাত্যাগের ধর্ম্মকে কি সেবাদাসীবিলসিত ইন্দ্রিয়সেবী কামুক নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম বলিবে? যে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে লুব্ধ হইয়া গলিতকুষ্ঠরোগী বিপ্র বাসুদেব দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া, ভগবৎসেবাবুদ্ধিতে কৃমিকীটকেও সযত্নে নিজ দেহদ্বারা পোষণ করিতেছেন, আর প্রেমানন্দে প্রভুগুণগান করিতেছেন, সেই দধীচি-সমানকারী ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষ যে ধর্ম্মের চিত্র, তাহা কি পুরীষভোজী আত্মসুখ-

সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম হইতে পারে? যে ধর্ম জাতিকুল অবিচারে, শ্রেষ্ঠনিকৃষ্ট নির্ব্বিশেষে, পরিত্যক্ত অধম পতিত পাপী-তাপিকে ডাকিয়া ডাকিয়া আলিঙ্গন করিয়া, তাহাদিগকে প্রেম-রাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতেছে, সেই অত্যুদার মহাপ্রীতির সার্ব্ব-ভৌম ধর্ম্ম কি সঙ্কুচিতমনা প্রেমগন্ধবিহীন ধর্মধ্বজীর ধর্ম্ম হইতে পারে? কখনই না। ভোগত্যাগ ও চরিত্রগঠন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধানকার্য্য। ভোগবাসনার গন্ধমাত্র থাকিতে তুমি বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভোগবাসনা ও মুক্তিকামনা পিশাচীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণ জীবকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই পিশাচী থাকিতে ভক্তিদেবীর উদয় কিরূপে হইবে? এখন বুঝ, বৈষ্ণবতা কি বস্তু। বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নহে, মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছিলেন—

বৈষ্ণব হইতে মোর বড় ছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম অপ্রাকৃত প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা মধুর রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। প্রেমের সহিত কামের বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় লোকগুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাই এ বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, বারংবার বলিয়াছেন—"শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়"। যাহারা আহার বিহার লইয়া থাকিবে তাহারা কৃষ্ণ পাইবে না।

বিষয়ভোগ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তু যেমন পূর্ব্বদিকে গমন করিলে কদাপি লাভের আশা নাই, সেইরূপ যাহার মন বিষয়ে আবিষ্ট, তাহার পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদূরপরাহত। মায়াকবলিত দুর্ব্বল জীব আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, এইজন্য বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ একবারে নিষেধ করিলেন এবং নিজের অতি মমতার পাত্র অন্তরঙ্গভক্ত-বিসর্জ্জনরূপ কঠোরশাসনের অবতারণা করিয়া ইহার সুদৃঢ় মনুমেণ্ট রাখিয়া দিলেন। ছোট হরিদাস প্রভুর প্রিয়-ভক্ত, তাঁহার মধুরকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর উল্লাস হইত। প্রভুসেবার জন্য শ্রীভগবান্ আচার্য্যের কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ছোট হরিদাস মাধবীনাম্নী জনৈকা ভক্তিমতী প্রাচীনা বৈষ্ণবীর নিকট হইতে চাউল বদ্‌লাইয়া আনিয়াছিলেন, সেই ছল ধরিয়া মহাপ্রভু হরিদাসের* 'দ্বারমানা' করিলেন। প্রভুর বিরাগে ভক্তের মস্তকে অশনিপতন হইল, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ছোট হরিদাস ভূপতিত হইলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রভুত্যক্ত জীবনের অব-সান করিবেন বলিয়া "ধন্না" দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বৈষ্ণব-মণ্ডলীমধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেহ আর স্বপ্নেও

* সদর দরজা পার হইয়া সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না এই শাস্তি দিলেন।

প্রকৃতির নাম মুখে আনেন না। একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিয়া গেল, ছোট হরিদাস তুলসীবেদিকার তলে কাষ্ঠবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন, অঘোর নয়নে ঝুরিতেছেন, জীবদুঃখকাতর বৈষ্ণব-মণ্ডলী অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই অনুরোধ লইয়া কে মহাপ্রভুর নিকট যাইবে? ভগবান্ আচার্য্য মর্ম্মাহত, ধরিতে গেলে তিনিই মূলকারণ, তিনিই ত হরিদাসকে মাধবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে।

তিনি শতবার হরিদাসের নিকট যাইতেছেন, সহস্রবার লুকাইয়া গোবিন্দের নিকট যাইতেছেন, আর লক্ষবার স্বরূপ গোস্বামীর নিকট ছুটিতেছেন। আশা, যদি কেহ মহাপ্রভুর মন নরম করিতে পারে, তবে নিত্যানন্দ পারিবেন, আর পারিবেন স্বরূপ দামোদর। কিন্তু দয়াল নিতাই যে গৌড়দেশে, তাঁহাকে পাইবার ত উপায় নাই, তাই স্বরূপই একমাত্র ভরসাস্থল; সকলে মিলিয়া স্বরূপকে ধরিলেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ সখা। প্রভুকে উত্তমরূপ জানেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়; মমতা ও কাঠিন্যের চূড়ান্ত আধার। কুসুম হইতেও কোমল আবার বজ্র হইতেও কঠিন। যখন তিনি হঠ ধরিয়াছেন তখন অনুরোধে কোন ফল হইবে না, তবু চক্ষের উপর একটী ভক্ত অনাহারে মরিতেছে, তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েক-জন প্রধান ভক্তকে সঙ্গে লইয়া, সভয়ে মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন, অন্য কথাবার্ত্তার পর ছোট হরিদাসের কথা পাড়িলেন। ধর্ম্ম-সংস্থাপক ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আসিয়াছেন, সংসার করিতে আসেন নাই; ছোট হরিদাসের নাম শুনিতেই প্রেমময়মূর্ত্তি বজ্রসার হইলেন, রোষাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ,
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ,
দারবী প্রকৃতি হরে "মুনেরপি" মন।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া,
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।

ইন্দ্রিয়সংযম অতি সুকঠিন, কেবল জ্ঞান থাকিলেই হয় না; কামিনীর কুহকে মহাযোগিরও যোগভঙ্গ হইয়া যায়, কাঠের সুন্দরীমূর্ত্তি দেখিয়া মহাজ্ঞানী মুনিরও বিকার উপস্থিত হয়, আর তাই লইয়া খেলা। কৌপীন ধারণ মর্কটবৈরাগী সাজিলেই হইল? আমি ঐরূপ ভণ্ডের মুখদর্শন করি না, ক্রোধ করিয়া মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে গেলেন, নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া সকলে চলিয়া আসিলেন। আরও ৩। ৪ দিন কাটিয়া গেল তবু মহাপ্রভুর মন নরম হইল না, হরিদাস অনাহারে পূর্ব্ববৎ পড়িয়া আছেন। করুণহৃদয় বৈষ্ণবগণ মহামুস্কিলে পড়িলেন, উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার কয়েকজনকে লইয়া, স্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট গেলেন, সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "সপ্তাহ অতীত হইল অপরাধী অন্নজল ত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছে, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, এই বারের মত আমরা ক্ষমাভিক্ষা চাহি"। লোকশিক্ষাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য, কাজেই বজ্রাদপি কঠোর হইয়াই রহিলেন।

প্রভু কহে, মোর বশ নহে মোর মন,
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।

নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা,
পুনঃ যদি কহ, আমা না দেখিবে হেথা।

সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ভগবান্, শেষে কি আমরা মহাপ্রভুকে হারাইব?

ছোট হরিদাসের প্রস্তাব লইয়া আর কে যাইবে? কিন্তু একটী জীব অনাহারে মারা যায় তাহাও অসহ্য, তখন সকলে যুক্তবুদ্ধি করিলেন, শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীকে যাইয়া সকলে ধরিলেন। জীবের দুঃখ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকটে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব সব বুঝিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি আজ্ঞা, কেন কৈলে আগমন"? সরল সন্ন্যাসী তখন "হরিদাসে প্রসাদ লাগি, কৈল নিবেদন"।

মানবীয় প্রকৃতি হইলে আর লড়িতে পারিত না, এইখানেই একটা আপোষ করিয়া ফেলিত। একে অন্তরঙ্গ ভক্ত মৃতপ্রায়, তাহে অভাবনীয় কঠোরতায় ভক্তমণ্ডলীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষিত, আবার এক্ষণে ইষ্টদেব পরম ভক্তিভাজন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভ্রাতা পরমানন্দপুরীর অলঙ্ঘ্য অনুরোধ। কিন্তু জীবোদ্ধার যজ্ঞ অতি দুষ্কর, তাহার প্রারম্ভেই বৃদ্ধা জননীর স্নেহ ও নবীন ভার্য্যার প্রণয় যজ্ঞে আহুতি দিতে হইয়াছে, এখন উদ্‌যাপন সময়ে লক্ষণবর্জ্জন-রূপ অতিপ্রিয় ভক্ত প্রাণ আহুতি দিতে হইবে। তাই প্রেমময় কর্ত্তব্যানুরোধে পাষাণ হইয়াছেন, "পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ", কোন উপরোধ টিকিলনা বরং উল্টা ফল হইল। বলিলেন "প্রভো আমায় ক্ষমা করিবেন, মোর মন নহে মোর বশ, আমায় অনুমতি

করুন আমি একমাত্র গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে যাই, আপনি বৈষ্ণবমোহান্ত লইয়া এইখানেই অবস্থান করুন”; এই বলিয়াই পুরী গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া “আইস গোবিন্দ” বলিয়া করঙ্গ লইয়া বাহির হইলেন। সকল পুরীপাদ একেবারে হতবুদ্ধি, একি সর্ব্বনাশ, ইহাতে যে এতদূর হইবে তাহা ত তিনি আদৌ ভাবেন নাই, অস্তে ব্যস্তে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের হাতে ধরিলেন “বাবা আমি আর কিছু বলিব না, তুমি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা হয় কর, তোমার খেলা আমরা কি বুঝিব” ?

যে তোমার ইচ্ছা তাই কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥

মহাপ্রভু থামিলেন শ্রীপাদ পুরীগোঁসাই নিজস্থানে ফিরিলেন, ভক্তগণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন ভক্তমণ্ডলী অন্তবুদ্ধি করিলেন, সকলে যাইয়া হরিদাসকে বুঝাইলেন “তুমি ত জান, প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তবে পরমদয়ালু, অবশ্যই কোন সূত্রেই একদিন তোমাকে কৃপা করিবেন, স্নানাহার কর, নচেৎ প্রভুর হঠ কমিবে না”। হরিদাস ভক্তবাক্য প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু পূর্ণ এক বৎসর কাটিয়া গেল, তবু প্রভুর কৃপা হইলনা, তখন পরিত্যক্ত ভৃত্য প্রভুপদ চিন্তা করিয়া প্রয়াগের ত্রিবেণীতে প্রবেশ করতঃ আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। কি কঠোর শাসন! কি অলৌকিক শিক্ষা! কেবল জীবশিক্ষার জন্য আজ প্রেমৈকজাতমূ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তবিসর্জ্জনরূপ

সকল ক্লেশ সহ্য করিলেন। "প্রিয়ভক্তে দণ্ডকরে ধর্ম্ম বুঝাইতে"। ইহা অপেক্ষা আর বেশী সাবধানতা কি হইতে পারে? কিন্তু বলিহারি মায়া! ত্রিরাত্র যাইতে না যাইতে জীব সব বেত্রাঘাত ভুলিয়া গিয়াছে!

হরিদাস—বুঝিলে কি হইবে? কামিনীকাঞ্চনের যে মোহিনী শক্তি তাহাতে কিছুতেই সুস্থির থাকিতে দেয়না।

গুরুদেব—তাই অধঃপতিত জীবের জন্য শাস্ত্রকেও অতি নির্লজ্জ নিয়ম করিতে হইয়াছে—"তোমার মায়ের সহিতও তুমি একাসনে বসিবে না"। অহো, ইহা কি মানবসমাজ! না পশু-সমাজ!

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

বলবান্ ইন্দ্রিয় জ্ঞানীকেও পরাস্ত করে, সুতরাং মায়ের সহিত, শাশুড়ীর সহিত, বা কন্যার সহিত একাসনে বসা উচিত নহে।

হরিদাস—প্রভো, তবে ইহার হাত হইতে পরিত্রাণের কি উপায় নাই?

গুরুদেব—উপায় পূর্ব্বে বলিয়াছি "সৎসঙ্গ"। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গ পলাইয়া যাইবে। তাই শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

বিধি—নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ খাইতে শুইতে সকল কর্ম্ম মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে, আর নিষেধ—কখনই তিলমাত্রও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে না। শাস্ত্রের অন্য যাবতীয় বিধিনিষেধ এই বিধিনিষেধের অনুগত কিঙ্করস্বরূপ।

হরিদাস—খুব হিতকর উপদেশ বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় সংসারীর পক্ষে উহা প্রতিপালিত হওয়া কঠিন। চব্বিশ ঘণ্টা পূজার্চ্চনা যাগযজ্ঞাদি লইয়া থাকিলে সংসার চলিবে কিরূপে? আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পরম দয়াল অবতার শ্রীচৈতন্য-দেব আমাদের জন্য (Religion made easy) সরল ভজনপন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই উপদেশ করুন। শুনিতে পাই ভক্তি-যোগের মধ্যে আবার মধুররসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব, কিরূপে সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি নিবেদন করা যায়, তাহাই কীর্ত্তন করুন।

গুরুদেব—মন্দ আব্দার নহে, ক, খ, না শিখিতেই বেদান্ত সূত্র! ভূমিষ্ঠ না হইতেই গাছে উঠিয়া সুমধুর অমৃতফল খাইবার ইচ্ছা! ইহাতে কোন ফললাভ হয় না, কেবল লাঞ্ছনামাত্র ঘটে, আমরা অধিকার ভেদ না মানিয়া নিজেরা মজিতেছি এবং দেশ-কেও মজাইতেছি। করুণাময় মহাপ্রভু কলির জীবকে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বিপন্ন দেখিয়া অতি সরল ও স্বাভাবিক ভজনপন্থা নির্দ্দেশ করিলেও তাহার ক্রমানুশীলন আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমত সাধন করিতে হইবে, তবেই অভীষ্টবস্তু লাভ হইবে।

যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন।

—— * ——

শুকদেব—প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীসনাতনকে যুগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার সময়ে নিজেকে ধরা দিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ভাগবত।

যিনি ভিতরে কৃষ্ণ অথচ বাহিরে গৌর, সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা সেই যুগাবতারকে এবং তদীয় অঙ্গ উপাঙ্গ ও পার্ষদগণকে ভজনা করেন।

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তাহা কৈল প্রবর্ত্তন॥

এখানে সূচিত হইল যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব। অঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত। উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি, আর অস্ত্র শ্রীগদাধর প্রভৃতি। দৈত্য সাদৃশ পাষণ্ড, উদ্ধারের উপায় নাম সঙ্কীর্ত্তন। তৎপরে প্রশ্ন উঠিল ফলাফল কিরূপ? তাহা আরও চমৎকার!

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে জ্ঞানযোগ প্রবল, তখন মহাজ্ঞানী ঋষিরা ধ্যানস্থ হইয়া যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, কর্ম্মপ্রধান ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজার্চ্চনা করিয়া যে সিদ্ধিলাভ

ছুইয়াছে, দ্বাপরে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার পাইয়া প্রেমসেবাদ্বারা ব্রজবাসীরা যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন, কলি-যুগে তৎসমুদায়ই হরিনামসংকীর্তনদ্বারা লভ্য হইয়া থাকে।

অন্নগত-প্রাণ অতিদুর্ব্বল কালহত জীব যখন জ্ঞানকর্ম্মযোগের খরস্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল, তখনই করুণাবতার ভব-কর্ণধার শ্রীচৈতন্যদেব হরিনামের তরণী লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)।

হে অবোধ জীব, বৃথা লাঞ্ছিত হইতেছ কি জন্য? কলিতে কেবলমাত্র হরিনাম ভিন্ন গত্যন্তর নাই নাই নাই। তিনসত্য করিয়া বলিতেছি, বৃথা কষ্ট পাইও না নামাশ্রয় কর। যাঁহারা সুমেধা, সুচতুর কেবল তাঁহারাই মহাপ্রভুর বাক্য শুনিলেন। আমরা হতভাগ্য, তাই চিন্তামণি ধন হাতে পাইয়াও ফেলাইয়া দিয়াছি। অবিশ্বাসী আমরা প্রভুবাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; তর্ক তুলিলাম, মন্ত্রতন্ত্র যাগযজ্ঞদ্বারা যে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, যে সংসারবন্ধন দূর হয় না, তাহা কি কেবল নাম করিলেই হইবে, দয়াল প্রভু তাই আবার বলিলেন—

নামবিনু কলিকালে নাই আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

আর বাকী রহিল কি? সর্ব্বানর্থ দূর হইল, আবার কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইল।

নামমহিমা বর্ণনাতীত; গৌরগণ সকলেই নামরসে বিভোর, তন্মধ্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মূর্ত্তিমান্ নামসাধন, যবনেরা তাঁহাকে হরিনাম ছাড়াইবার জন্য অতি নির্দ্দয়ভাবে বাইশবাজারে বেত্রা-ঘাত করিতেছে, চর্ম্মমাংস খসিয়া যাইতেছে, রুধিরধারায় সমস্ত ভাসিয়া যাইতেছে, তবু নামনিষ্ঠ সুদৃঢ়ব্রত হরিদাস বলিতেছেন—

খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ—
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥

সেই হরিদাস বলিতেছেন—"কৃষ্ণনাম" দূরে থাকুক, "নামা-ভাসেই" মুক্তি হয়।

হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চোর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় ত্রাস।
উদয় হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥

শ্রীচরিতামৃত।

আমি একবার সারকাস্ (Circus) দেখিতে গিয়াছিলাম; দেখিলাম, বৃহদাকার একটি খাঁচা মধ্যে সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, সর্প, এই ছয়টী অতিভীষণ হিংস্রজন্তু রহিয়াছে। সেখোনাও একজন খেতকায় পুরুষ, তাঁহার হস্তে কোন অস্ত্র নাই

কেবল একখানি ক্ষুদ্র যষ্টি (Wand) মাত্র। খাঁচার নিকট যাইতেই অঙ্গগন্ধ পাইয়া হিংস্রজন্তুগুলি শিকারের লোভে ঘুরিতে লাগিয়াছে, কেহ গর্জ্জন করিতেছে, কেহ লম্ফঝম্প দিতেছে, কেহ বা মুখব্যাদান করিতেছে, একবার পাইলেই হয়। দর্শক-মণ্ডলী মহাভীত হইলেন, অনেকে বলিলেন, "ঐ খেলায় আর কাজ নাই", কেহ কেহ চক্ষে রুমাল দিলেন, কিন্তু নির্ভীক খেলোয়াড় ওস্তাদের নাম স্মরণ করিয়া একলম্ফে খাঁচার মধ্যে পড়িলেন, জানোয়ারগুলি সকলেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি! কি অপূর্ব্ব প্রভাব! খেলোয়াড় সুকৌশলে যেমন সেই যষ্টিখানি ঘুরাইতেছেন, অমনি হিংসা ছাড়িয়া হিংস্রজন্তুগুলি সরিয়া যাইতে লাগিল শেষে মর্ম্মাহত হইয়া নিরুদ্যম হইয়া রহিল। সর্পটী এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকক্ষণ খেলোয়াড়কে জ্বালাতন করিল, সতর্ক খেলোয়াড় শেষে তাহার উন্নত ফণায় ঐ যষ্টি স্পর্শ করিলেন, অমনি সুড়সুড় করিয়া গোত্ত সরিয়া পড়িল। খেলোয়াড় অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের চিত্রও ঠিক্ এইরূপ। সংসারপিঞ্জরে কামাদি ষড়রিপু গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। এখানেও ঐ খেলোয়াড়-পুরুষের ন্যায় সুকৌশলে হরিনামদণ্ড ঘুরাইতে পারিলে কেহই জীবের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। নামপ্রভাবে সর্ব্বাপদ দূর হইয়া যাইবে।

হরিদাস—কেবলমাত্র নাম নিলেই কি ইন্দ্রিয়সংযম ও সংসার-বন্ধন দূর হইবে?

গুরুদেব—তৎপক্ষে দ্বিধামাত্র নাই, ইহার শত শত চিত্র রহিয়াছে। ঠাকুর হরিদাসকে বিচলিত করিবার জন্য দুষ্টবুদ্ধি

রামচন্দ্র খান জনৈকা সুন্দরী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বেশ্যা তাঁহার কুৎসিত অভিপ্রায় জানাইল, হরিদাস ঠাকুর কোটি নামযজ্ঞে ব্রতী, তিনি অনুক্ষণ নামগ্রহণে ব্যাপৃত। বেশ্যা দ্বারদেশে বসিয়া নাম শুনিতেছে আর সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, একরাত্রি দুইরাত্রি তিনরাত্রি কাটিয়া গেল; তিনরাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল, ভাগ্যবতী তখন ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥

ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—

নিরন্তর নাম লও কর তুলসীসেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

যে বেশ্যা কত জীবের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কেশাগ্র পর্য্যন্ত যাহার পাপকালিমায় পূর্ণ, নামবলে সেই বেশ্যার ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত হইল, বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী হইলেন।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥

ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত চিত্র কি দেখিবে?

হরিদাস—কেহ কেহ বলেন "নাম জপাদি শাস্ত্রজ্ঞান-বিরহিত নিম্নশ্রেণীর সাধকের জন্য"?

গুরুদেব—কে বলিয়াছে? উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ অধিকারীর জন্যই "নাম", কেহই বাদ নহেন।

মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অধিকারী কে আছে? এবং গৌড়রাজের প্রধানামাত্য মহা প্রবীণ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা শ্রীসনাতন অপেক্ষা উচ্চাধিকারী বা আর কে আছেন। তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন শুন—

পণ্ডিতশিরোমণি সার্ব্বভৌমের জ্ঞানগরিমা যখন নিরস্ত হইল, তখন তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া নিজ কৃতাপরাধের ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া মহাপ্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হয় মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

আবার শ্রীসনাতনকে বলিলেন—

নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

নাম সর্ব্বব্যাপিতত্ত্ব, নামগ্রহণে পাত্রাপাত্র দেশকালের কোন বিচার নাই, সকলে সকল স্থানে সকল অবস্থায় নাম লইতে পারেন, তাহাতে শুচি অশুচি বা সময়াসময় নাই। মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কালদেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা আর হইতে নাই। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান কেহই বাদ পড়িল না, জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত পতিত

অধম পাতকীরাও আশ্রয় পাইল, বরং নিরাশ্রয় অধম পাতকীর প্রতি মহাপ্রভুর অধিকতর কৃপা। তিনি নিজেই সনাতনকে কি বলিতেছেন শুন—"সনাতন কৃষ্ণভজনের কোন জাতিকুলাদির বিচার নাই। বরং জাতিমদ, বিদ্যামদ ও ধনমদ ইহার বিশেষ প্রতিকূল, অভিমান তাহাদিগকে দীনহীন হইতে দেয় না, তাহাদের প্রপন্নভাব আইসে না। কলিযুগ অধমতারণযুগ, যার কিছু নাই কেবল কান্না আছে, তাকেই আগে ডাকিয়া পার করে"।

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

হরিদাস—অহো, আমাদের কি মহাভাগ্য, স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত হইয়া কি আশার বাণী প্রচার করিতেছেন! সত্যই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় পরম দয়াল অবতার ত্রিজগতে আর হইতে নাই—

চৈতন্য সমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাই আর ত্রিজগতে ধন্য॥

তবে কি প্রভু প্রায়শ্চিত্তাদির আর আবশ্যকতা রহিল না?

শ্রীগুরুদেব—বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্থলবিশেষে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু নৈষ্ঠিকভক্তের পক্ষে তাহাও অনাবশ্যক, হরিনামই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

"কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীচরিতামৃত।

আবার মহাপ্রভু নিজে কি শিখাইয়াছেন শুন—সুবুদ্ধিরায় এক সময়ে গৌড়াধিপতি ছিলেন; হোসেন সা তাঁহার কর্ম্মচারী, কোন ত্রুটি জন্য হোসেন সা বেত খাইয়াছিলেন। কালক্রমে হোসেনের ভাগ্য ফিরিল, হোসেন নবাব হইলেন, তখন বেগমের পীড়াপীড়িতে করোয়ার পানি দিয়া হোসেন সা সুবুদ্ধি রায়ের জাতি মারিলেন। হিন্দুসমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বঙ্গের স্মার্ত্তশিরোমণিরা পাঁতি দিলেন "তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে"। সুবুদ্ধি ৺কাশীধামে চলিয়া গেলেন। ৺কাশীর পণ্ডিতেরা মূল ব্যবস্থা ঠিক রাখিলেন, কেবল অনুপান বদলাইলেন, "মৃত্যু" ঠিক্ রহিল তবে "তপ্তঘৃত পানে"। শাস্ত্রের এই সুবিচার দেখিয়া সুবুদ্ধি হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তৎসময়ে মহাপ্রভু ৺কাশীধামে আসিলেন। সুবুদ্ধির সুবুদ্ধি উদয় হইল; তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপ্রভু শাস্ত্রের দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বাপুহে তুমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিও না, এখনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও, আর নিরন্তর হরিনাম করগে, তাহাতেই সব পাপতাপ যাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ মিলিবে"।

প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

শ্রীচরিতামৃত।

সব প্রায়শ্চিত্ত মিটিয়া গেল। সুবুদ্ধি জীবনের অবশিষ্টকাল নামকীর্ত্তন, বৈষ্ণবসেবা এবং শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের দুর্লভসঙ্গে, পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন।

হরিদাস—প্রভো', নামমহিমা আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরুদেব—নামমহিমা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। নামের অনন্তশক্তি, অনন্তক্রিয়া, তন্মধ্যে ত্রিবিধক্রিয়া সাধক-জীবনে বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) "নাম দুর্ভেদ্য ব্যূহ" আর নামাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্যূহরক্ষক নিত্য প্রহরী। শরণাগত সাধককে শ্রীচৈতন্যদেব নামব্যূহদ্বারা আবরিয়া রাখিয়া নিজে গুরুরূপে দ্বারদেশে রহিয়াছেন। পাপপ্রবৃত্তি অনুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কিন্তু নিরন্তর হরিনাম চলিতেছে, নামব্যূহ দুর্ভেদ্য, পাপপথ পাইতেছে না, সুতরাং সাধকের নূতন পাপ-সঞ্চয়ের আশঙ্কা থাকে না। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ—"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন"। উচ্চ কীর্ত্তনের অসুবিধা বুঝিলে নামজপ বা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণই সাধকের প্রাণ, সাধককে সর্ব্বদা সচেতন রাখে। বৈষ্ণবাকাশের ধ্রুবতারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাই বলিয়াছেন—

ছয় রিপু সদা হীন,　　করিব মনের ভিন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।
আপনি পলাবে সব　　শুনিয়া গোবিন্দ রব
সিংহরবে যেন করিগণ॥

(খ) "হরিনাম অমোঘ ঔষধ" ইহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা। মায়াকবলিত জীব পাপে জর্জ্জরিত, বিকারগ্রস্ত ও মুমূর্ষু। ত্রিতাপ-জ্বালা অনুক্ষণ হতভাগ্যকে দগ্ধ করিতেছে, অথচ মোহমদিরাপানে জীব বেহুঁস। কামাদি অনর্থ তাহার অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে অথচ জীব অনুক্ষণ তাহাদের সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু হরিনামৌষধের কি অপূর্ব্ব শক্তি! নামপ্রভাবে দেখিতে দেখিতে অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপকালিমা বিদূরিত হইতে থাকে, পূর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হইয়া পাপবীজ পর্য্যন্ত উন্মূলিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আইসে। জীব রোগবিমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাবে ফিরিয়া আইসে।

(গ) "হরিনাম কল্পতরু" আলাদিনের* প্রদীপ, যাহা চাইবে তাহাই মিলিবে। অতিদুর্লভ পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধন, তাহাও হরিনামে লভ্য হয়।

রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা কি বলিতেছেন শুন—

নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

---

* আরব্যোপন্যাসের লিখিত আলাদিনের প্রদীপের অপূর্ব্ব শক্তি, প্রদীপ ঘসিলেই দৈত্য উপস্থিত হয় এবং আদেশমত কার্য্য করে।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।

(১) চেতোদর্পণমার্জ্জন—জীবের চিত্ত দর্পণের ন্যায় মূলে স্বচ্ছ ছিল, পাপকালিমায় ক্রমে মলিন ও কর্কশ হইয়াছে, সঙ্কীর্ত্তন রূপ "মার্জ্জন" লাগাইতে লাগাইতে ক্রমে কালিমাবিমুক্ত হইয়া মসৃণ হয়, তখনই প্রেমসূর্য্যোদয়ের যোগ্য হয়।

(২) ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—সংসারী জীব ত্রিতাপদগ্ধ, কৃষ্ণনামামৃতরসে জীব শান্ত হয়।

(৩) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং—চন্দ্র যেমন শুভ্র কিরণ বিতরণ করিয়া জগজ্জীবকে শীতল করেন, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন তদ্রূপ মঙ্গল বিতরণ করিয়া থাকেন।

বিদ্যাবধূজীবনম্—বিদ্যা কাহাকে বলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণভক্তি বিনা জীবের বিদ্যা নাই আর"।

সঙ্কীর্ত্তন সেই কৃষ্ণভক্তিরূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ।

"তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥"

(৫) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্—শ্রীনামে প্রেমানন্দ-সমুদ্র ফাঁপিয়া উঠে।

(৬) প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং—সাধক পদে পদে পূর্ণামৃত পান করিতে থাকেন।

(৭) সর্ব্বাত্মস্নপনং—নামামৃতরসে আত্মা সম্যক্ বিগলিত হইয়া যায়, হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাকে না।

এমন সর্ব্বগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

হরিদাস—তবে কিজন্য শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ইহার অনুশীলন করেন না?

গুরুদেব—পরম দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব? দোকানী পশারিরা খোল মৃদঙ্গ করিয়া নাচে গায়, আমরা সভ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক কি তাই করিব? যেমন বুদ্ধি তেমনই দুর্গতি। পরামৃতের সন্ধান পাইয়াও ঘৃণাগরিমা আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। ইহার অদ্ভুতফল হাতে হাতে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের ফাঁকা গরিমার আবরণটা ঘুঁচিতেছে না। সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়রাজ্যের কথাই গীত, তাই সুর লয়যুক্ত কীর্ত্তনই সেই প্রেমরাজ্যের ভাষা। কীর্ত্তনই উদ্বোধন, কীর্ত্তনই আরাধনা, কীর্ত্তনই যোগ, কীর্ত্তনই সমাধি। কীর্ত্তনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী হয়, চিত্তের একাগ্রতা আইসে, অভীষ্ট বস্তুকে নিকটস্থ করে, মন প্রাকৃতরাজ্য ছাড়িয়া লীলাবিহারির লীলারাজ্যে চলিয়া যায়, তখন কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া ভক্ত ভগবানে ভাব বিনিময় করিতে থাকে, স্বেদ, পুলক স্তম্ভাদি অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় হয়। মহাপ্রভুর কৃপা হইলে ভাবসমাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুনিলে বিশ্বাস করিবে না, শত বৎসর কঠোর যোগসাধনায় যাহা লভ্য হয় না, ভগবৎকৃপা হইলে নামসঙ্কীর্ত্তনে তাহাও সুলভ হয়, অভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তি দর্শন পাইয়া ভাগ্যবান্ সাধক ধন্য হয়েন।

হরিদাস—শুনিয়াছি খেতুরের মহোৎসবাদিতে ঐরূপ অলৌ-

কিক দর্শন ঘটিয়াছিল, কিন্তু উহাতে আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত-গণের বড় একটা শ্রদ্ধা আইসে না।

গুরুদেব—শ্রদ্ধা কি আমাদেরই হইত? আমরাও দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়াছিলাম, এখন দায়ে পড়িয়া ঠেকিতে হইয়াছে। পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি মহোদয়গণ একসময়ে অলৌকিক দর্শনাদিকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানিবে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের পরিবর্ত্তনের মূলে এই অলৌকিক ঘটনা। আজও এইরূপ ঘটনা হইতেছে, তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনা একটী না বলিয়া পারিলাম না। গত ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর গ্রামে কয়েকটী ভক্ত সন্ধ্যাকালে আরতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন, কীর্ত্তনটী বেশ জমাট হইয়াছিল; "জগতরি রহল মহিমা প্রকাশ," এই পদটী ভক্তগণ প্রেমানন্দে গাহিতেছেন, অদূরে পাকগৃহে নগেন্দ্র* ছটফট করিতেছেন, কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উল্লাস, কিন্তু কীর্ত্তনে আসিতে পারিতেছেন না; ভাত পড়িয়া যায়, কিন্তু মন আর কিছুতেই থামিতেছে না, খোলের তালে তালে নাচিয়া উঠিতেছে, শেষে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন নামাইয়া রাখিয়াই নগেন্দ্র ছুটিলেন,—অহো ভাগ্য! কীর্ত্তনগৃহের দ্বার তেমান রহিয়াছে, আর দ্বারদেশে ঐ যে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! কি সুঠাম মূরতি! কি নবনীরদ বর্ণ! ললিতত্রিভঙ্গবেশে সুমনোহর গ্রীবাটী বাঁকাইয়া নিজ কীর্ত্তন শুনিতেছেন। নগেন্দ্রের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কদলীপাতের ন্যায়

* নগেন্দ্র ঢাকানিবাসী জাত সরলযুবক, লেখাপড়া বেশী জানেন না, সেটেলমেণ্ট অফীসে ৮৲ বেতন পাইতেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহমধ্যে যাইয়া নগেন্দ্র পড়িয়া গেলেন। নগেন্দ্রের আর বাহ্যজ্ঞান নাই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দতরঙ্গ খেলিতেছে, দেহ তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে, নয়নের মধ্যস্থান হইতে প্রেমবারি বহিয়া চলিয়াছে। সে কি নয়নধারা! যেন মন্দাকিনী ধারা চলিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া মধুরলীলাগান করিতেছে, সে গান এখানকার নহে, সে সুরও এখানকার নহে, মধুর কুঞ্জবিলাস যেন নয়নে প্রত্যক্ষ করিতেছে, আর তালে তালে নাচিতেছে ও প্রেমানন্দে গাহিতেছে। এইরূপে একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিয়া গেল, তবু নগেন্দ্রের বাহ্যমাত্র নাই, আহার নাই নিদ্রা নাই, শৌচাদি দৈহিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রুদ্ধ, অথচ পরমোল্লাসে সমস্ত দিনরাত্রি নগেন্দ্র নাচিতেছে, গাহিতেছে ও কাঁদিতেছে। চতুর্থ দিনে নগেন্দ্র পূজা ধরিলেন, মন্ত্র তাঁহার নিজের, পূজাও তাঁহার নিজেরই, তখন অর্দ্ধবাহ্য হইয়াছে। নগেন্দ্র কোন কোন লোককে ডাকিয়া লয়েন, আবার কোন কোন লোক দেখিলে চীৎকার করিয়া উঠেন, দরজা বন্ধ করিয়া দেন। অনেক নিগূঢ় শাস্ত্ররহস্য বলিলেন, অনেকের ভূতভবিষ্যৎ বলিয়া ফেলিলেন, এইরূপে আরও সাতদিন কাটিল, তৎপরে যে নগেন্দ্র সেই নগেন্দ্র হইলেন, কিন্তু এই ধাক্কায় তাঁহার জীবনের স্রোত ফিরিয়া গেল। আমার কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পার কিন্তু বি এ, এম এ, পাশ করা হাকিম সাক্ষী আছেন, তাঁহার কথা ফেলিবে কিরূপে? তিনি বরং আরও উত্তম জানেন।

হরিদাস—নাম যে শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠসাধন তাহা বুঝিলাম কিন্তু অনেককে নাম লইতে দেখিতেছি অথচ পাপকর্ম্মেও তাঁহাদেরই প্রবৃত্তি কমিতেছে না।

গুরুদেব—কথা ঠিক্ বটে, নিদানোক্ত অনুপান সংযোগে এবং ব্যবস্থামত পথ্যগ্রহণে ঔষধ সেবন করিতে হইবে, তবেই ঔষধে প্রত্যক্ষ ফল দর্শাইবে। গঙ্গাধর কবিরাজ জল লবণ বন্ধ করিয়া একটী বালককে চিকিৎসা করিতেছিলেন, উৎকৃষ্ট ঔষধ দিতেছেন ফল হইতেছে না, বরং রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে; সুবৈদ্য বুঝিলেন নিশ্চয়ই রোগী কুপথ্য করিতেছে, গোপনে পাহারার বন্দোবস্ত হইল, বালকের চুরি ধরা পড়িল। তখন বিশেষ কড়াকড়ি করিয়া রাখা হইল, অল্পদিনেই ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ হইল, বালক রোগমুক্ত হইল। ভবরোগ-বৈদ্য কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীও ঠিক্ ঐ কথাই বলিয়াছেন, "কৃষ্ণনাম অমোঘ ঔষধ" এই মহৌষধেতে ফল না হইলে বুঝিবে কুপথ্য হইতেছে, অর্থাৎ প্রচুর অপরাধ হইতেছে—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ শ্রীচরিতামৃত

নিতান্ত বেগারশোধ নাম লইলে চলিবে কেন? চরিত্রগঠনের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া অপরাধশূন্য হইয়া নাম লইতে হইবে। নামজপ করিতেছি আর মিথ্যা সাক্ষ্য শিখাইতেছি, তাহাতে সুফলের আশা কোথায়? সেরূপস্থলে লাভ অপেক্ষা বরং ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

হরিদাস—প্রভো, এতক্ষণ বুঝিতেছিলাম নাম যেরূপে ইচ্ছা লইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে, এখন আবার যে শক্ত হইল, বিধি-নিষেধ আসিল।

গুরুদেব—শুনিতে যত সোজা কাজে তত সোজা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীরূপশিক্ষার সময়ে মহাপ্রভু বলিলেন "হে রূপ, ভক্তিলতায় নামশ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে হয়, ঐ লতায় বড় উপগাছা জন্মে, সেইজন্য বিশেষ তদারক চাই, উপশাখা হইলেই কাটিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ জলসেচন পাইয়া বরং উপশাখা (ভোগ-বাসনা, মুক্তিকামনা, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, লাভপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি) বাড়িয়া যায়, আর মূলভক্তিলতা মৃতবৎ নিস্তেজ হইয়া থাকে।"

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়ে মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥

প্রথমেই উপশাখার করিবে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ শ্রীচরিতামৃত।

হরিদাস—অপরাধ বলিতে কি বুঝিব ?

গুরুদেব—প্রধানতঃ অপরাধ ত্রিবিধ—সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ। সাধকজীবনে এই অপরাধ যাহাতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে দীক্ষা দিবার কালে এজন্য বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন—

"সাবধানে নরোত্তম শুন এক কথা।
অন্তর্বাহ্যে অপরাধ না জন্মে সর্ব্বথা ॥"

প্রেমবিলাস।

বাহ্য ব্যবহারে বা মানসচিন্তায় কোন অপরাধ না ঘটে।

এইজন্যই বৈষ্ণব-সদাচারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে "আচার প্রভব ধর্ম্মস্য মূলম্" আচারই ধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সদাচারবিহীন সাধকের ভক্তিলাভ সুদূর-পরাহত। আমরা যতই সদাচারের প্রতি উদাসীন হইতেছি অপরাধ ততই অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিলাভের ফল ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে; প্রচুর কাঁটাগাছের চাপনে ভক্তিলতাও শুকাইয়া যাইতেছে। শাস্ত্রের বিধি যেমন মানিতে হইবে নিষেধও ঠিক্ তদ্রূপভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। গাছটী উত্তমরূপ ঘেরিয়া জলসেচন করিতে হইবে, তবেই তাহাতে ফল ধরিবে, আমি গাছ আদৌ ঘেরিলাম না, কেবল জল-সেচন করিতেছি, দাতের মধ্যে দু'দিনেই গাছটীর ধ্বংস হইল, আমি

কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিলাম। ভক্তি আলোচনা করিতে হইলে সেইজন্য নিরপরাধ হইতে হইবে, সুতরাং সদাচার পালন করিয়া চলিতেই হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের অভ্যুদয় হইবে কেন?

হরিদাস—তবে অপরাধগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরুদেব—(ক) সেবাপরাধ—'প্রেমভক্তি' বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, শ্রীবিগ্রহসেবায় প্রেমভক্তির শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেইজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজ জীবনে ও পারিষদ্ গোস্বামিগণের জীবনে শ্রীবিগ্রহ সেবায় অনুরাগ দেখিতে পাই। শিয়তমকে ঠিক্ নিজজন মনে করিয়া খাওয়াইতে শোয়াইতে হইবে, তবেই তাহাতে সম্ভ্রমভাব দূরে যাইয়া বিশুদ্ধ ভালবাসা জন্মিবে; "আপনি" ঘুচিয়া "তুমি" হইবে। কেবল পূজার্চ্চনা লইয়া থাকিলে সম্ভ্রম আরও পাকিয়া উঠে—শ্রীল মদনমোহন শ্রীসনাতনের সেবিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীসনাতন বিরক্ত বৈষ্ণব, অযাচক বৃত্তি। স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত অলবণ ভোগে মদনমোহনের মন উঠে না, তিনি একটুকু লবণ জন্য সনাতনকে স্বপ্ন দেখাইলেন,—সনাতন ধমকাইলেন, "যাহা জুটাইয়াছি তাহাই খাও, আমি কি তোমার জন্য এখন লবণ ভিক্ষা কর্ত্তে যাব?" কিন্তু মুখে ধমকাইলে কি হইবে, মন মানিল না; প্রিয়তমের সেবার কষ্ট হইতেছে, কাজেই লবণ আনিতে হইল। ইহাই প্রীতি, ইহাই প্রেমভক্তি, কিন্তু অধিকারিবিবেচনায় প্রথমাবস্থায় এই প্রীতিকে বিধিদ্বারা সংযত করিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহসেবাদিতে যে ত্রুটি তাহার নাম সেবাপরাধ, তাহা প্রধানতঃ ৩২ প্রকার,—[১] পাদুকাসহ বা যানারোহণে শ্রীমন্দিরে যাওয়া, [২] শ্রীরাসজন্মাদি উৎসবের অনুষ্ঠান না করা, [৩] শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম না

করা, [৪] উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় সেবাকার্য্য করা, [৫] এক হস্তে প্রণাম করা, [৬] শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা, তাঁহার অগ্রে [৭] পাদপ্রসারণ [৮] হস্তদ্বারা জানু ধরিয়া বসা, [৯] নিদ্রাজন্য শয়ন, [১০] ভোজন, [১১] মিথ্যাভাষণ, [১২] উচ্চ কথন, [১৩] পরস্পর বাক্যে গল্প করা, [১৪] মায়িক শোক জন্য রোদন, [১৫] কলহ, [১৬] কাহাকেও নিগ্রহ, [১৭] অনুগ্রহ করা, [১৮] নিষ্ঠুর বাক্য বলা, [১৯] কম্বল গাত্রে সেবা কার্য্য করা, (লোম পড়িবার আশঙ্কায়), [২০] পরনিন্দা, [২১] পরস্তুতি [২২] অশ্লীল ভাষণ [২৩] অধোবায়ু ত্যাগ, (শৌচাদি কর্ম্ম পূর্ব্বে সমাধা করা উচিত ও গুরুভোজন অকর্ত্তব্য) [২৪] অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, [২৫] সামর্থ্যস্থলে বিনা উপচারে বা স্বল্প উপচারে পূজা, [২৬] কালোপযোগী ফলাদি সেবায় না দেওয়া, [২৭] অপরের ভুক্তাবশিষ্ট প্রদান, [২৮] শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠদিয়া বসা, [২৯] শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে প্রণামাদি অভিবাদন করা, [৩০] গুরু কোন প্রশ্ন করিলে মৌনী থাকা, [৩১] আত্মপ্রশংসা, [৩২] দেবতানিন্দন।

প্রতিকার—অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের নিকট স্তবাদি পাঠ করিয়া ক্ষমা চাহিলে সেবাপরাধ থাকে না।

(খ) নামাপরাধ—দশপ্রকার (১) সজ্জনের নিন্দা, (২) বিষ্ণুনাম ছাড়া শিব নামাদির পৃথক্ জপ করা, (৩) শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা, (৪) বেদাদির নিন্দা, (৫) হরিনামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা অতিস্তুতি মনে করা, (৬) নামের কুব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনায় অর্থ করা, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) নামের সহিত অন্য

গুরুকার্যের তুলনা করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ, (১০) নামমহিমা শ্রবণেও নামে অপ্রীতি।

প্রতিকার—এই নামাপরাধ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিভরে কাতরপ্রাণে নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, এবং শাস্ত্রের অনুশাসন মত চলিতে হইবে অর্থাৎ পাপকার্য্য বা পরনিন্দা হইতে বিরত হইতে হইবে। সাধুনিন্দা ও শ্রীগুরুদেবে অশ্রদ্ধা ঘটিলে, অকপট সেবাদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে হইবে।

(গ) বৈষ্ণবাপরাধ—ছয় প্রকার—ইহা অতি ভীষণ, (১) বৈষ্ণবে তাড়ন অর্থাৎ প্রহার করা, (২) বৈষ্ণবে দ্বেষবুদ্ধি, (৩) বৈষ্ণব-নিন্দা, (৪) বৈষ্ণব দর্শনে অভিনন্দন না করা, (৫) বৈষ্ণবকে অপমান, (৬) বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষ না হওয়া। বৈষ্ণবাপরাধে পতন অনিবার্য্য, ইহাতে সমস্ত সুকৃতিনষ্ট হয় ও বুদ্ধিভ্রংশতা জন্মে। সাধুজন শ্রীহরির নিজদেহ সুতরাং বিন্দুমাত্র অবহেলায় শ্রীহরির কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অদোষদর্শী বৈষ্ণব নিজে অপরাধ গ্রহণ না করিলেও ভগবান্ অপরাধীকে কঠোর ক্লেশ দেন।

প্রতিকার—যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে সেই মহানুভবের শরণাগত হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া নিজে ক্ষমা করিয়া শ্রীহরি-চরণে ঐ অপরাধীর জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাহিলে তবেই মুক্তি। জগাই মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিল, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাদিগকে প্রথমে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, জিদ্ ধরিলেন। শেষে দয়াল নিতাই যখন জগাই মাধাইকে নিজে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাদের পাপভার নিজে লইয়া যখন ক্ষমার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে নাছোড় হইয়া ধরিলেন, তখনই

কৃপা হইল। ফলকথা এবিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে বলিয়া, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গোস্বামিপাদেরা সতর্ক করিয়াছেন "নান্যদোষানুদীরয়েৎ" কাহারও দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আবার বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে মহাপ্রভু কি বলিতেছেন শুন—

ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া সদা কহে গৌরধাম।
অনিন্দুক হ'য়ে সদা লহ কৃষ্ণনাম॥

হরিদাস—নিন্দা কি জন্য এত দূষণীয়? দোষীরও কি নিন্দা করিতে নাই?

গুরুদেব—না, গোস্বামিপ্রভুরা কেবল বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা দেন নাই,—যাঁহাকে এক্ষণে ঘোর বেশ্যাসক্ত দেখিতেছ, পরমুহূর্ত্তেই সেই ব্যক্তি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইবেন সুতরাং নিন্দা না করাই উত্তম। নিন্দা না করিয়া বরং তাহার মঙ্গলজন্য তাহাকে সংশোধন হইতে বলা উচিত ও ভগবানের নিকট তজ্জন্য কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। নিন্দা জীবকে পর করিয়া দূরে তাড়াইয়া দেয়, ইহাতে প্রীতির হানি এবং আত্মগরিমার সৃষ্টি হইয়া, নিজের পতনের কারণ হয়।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিৎ, সাধুজনের বিদ্বেষ কেবলমাত্র মৃত্যুর হেতু নহে, তাহাতে অশেষ পুরুষার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরও

আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, কল্যাণ এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন ভোগবাসনা, মুক্তিকামনা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠা "শূকরীবিষ্ঠা" ইহা সাধকের বিশেষ সর্ব্বনাশকর।

হরিদাস—এই "অপরাধ" দেখিতেছি সর্ব্বানর্থের হেতু, যত কেন ভজন সাধন করি না, দুগ্ধে গোমূত্রবিন্দু মিশ্রণের ন্যায় সবই ব্যর্থ করিয়া দিবে।

গুরুদেব—ঠিক্ কথা বটে, তুমি মায়ারাজ্য ছাড়িয়া যাইতে চাহ, মায়া তোমাকে সহজে ছাড়িবে কেন? ছলে বলে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা হইতে দূরে লইবার চেষ্টা করিবে। রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ; তাই সাধককে সর্ব্বদাই প্রপন্ন হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন থাকিতে হইবে। সাধকচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর একজন্য কিরূপ কাঁদিয়াছেন দেখ—

যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈল ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
আমা সম নাহিক অধমা॥
পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সর্ব্ব যেন সতীপতি॥

পরপুরুষে আকৃষ্ট না হইলে সেবায় ত্রুটি বা অন্যবিধ অপরাধ জন্য স্বামী কখনও সতীকে পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু ক্ষমা করিয়া থাকেন এবং সতীরও তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবারই মুখ থাকে, তদ্রূপ ভক্ত কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার শতদোষ ক্ষমা করেন। নরোত্তম প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিজের অপরাধ যাহা হইয়াছে ও হইবে জানাইয়া ক্ষমা চাহিতেছেন। এই অকপট শরণাগতিই সাধকের রক্ষার একমাত্র উপায়। শ্রীগীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ সমস্ত শিক্ষা দিয়া শেষে "সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশটী শিখাইলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অতি প্রিয়, সেইজন্য শপথপূর্ব্বক আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতেই একনিষ্ঠ হও, আমাকেই ভজনা কর, কেবল আমাকেই অর্চ্চনা কর, আর প্রপন্ন হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দণ্ডের ন্যায় আমার চরণে পতিত থাক, নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। ইহা অপেক্ষা সুদৃঢ় অভয়বাণী আর কি হইবে? আমরা ঘোর অবিশ্বাসী, তাই প্রভুকে আবার "শপথ" করিতে হইল, "প্রতিজ্ঞা" করিতে হইল।

হরিদাস—বুঝিলাম, এই শরণাগতি হইতেই শ্রীকৃষ্ণ কৃপালাভ হইবে, এবং কৃষ্ণকৃপা হইলে তখন আর উজান ভাটী থাকিবে না স্রোতে টানিয়া লইবে।

শ্রীগুরুদেব—ঠিককথা, অন্ত পন্থায় পুরুষকারের একটা অভি-

থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগে এই শরণাপত্তিই সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র। অজেয় হইলেও তিনি "পায়ে পড়ায়" নিকট পরাস্ত হন। সেইজন্য প্রপন্ন হইয়া নামগ্রহণের উপদেশ, "শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ স্মরি, রাধাকৃষ্ণ হৃদে হেরি, জপ নাম প্রপন্ন হইয়ে"। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-চরণে সটান হইয়া পড়িয়া নিজ অভীষ্ট যুগলমূর্ত্তির দিকে চক্ষু রাখিয়া প্রভুকে কেবল পরিত্রাহি ডাকিবে। তাই কলিযুগের সিদ্ধনাম "হরেকৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে" সব সম্বোধনবাচক। মুগ্ধা রাজকন্যা সরলাবালিকা, দুষ্টাবুদ্ধি দাসীর কুহকে পড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,—দাসী কৌশলে বালিকাকে মদিরাপান করাইয়াছে, সরলা বালিকার রত্নালঙ্কারাদি সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া একখানি জীর্ণ তরীর উপর শোয়াইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে; নেশা ছুটিলে বালিকা দেখিল,—বিশাল সমুদ্র, তাহার পারাপার নাই, উত্তালতরঙ্গ, জীর্ণ তরিখানিকে একবার আকাশে উঠাইতেছে আবার পরমুহূর্ত্তেই রসাতলে নামাইতেছে, মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা অবলা হতভাগি-নীকে আত্মহারা করিয়াছে,—বালিকা সেই জীর্ণতরীর কাষ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া, প্রাণপণে অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে পরিত্রাহি ডাকিতেছে—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে"॥ তখন নাম ছাড়া আর কিছু নাই, কেবল পরিত্রাহি চীৎকার, ক্রমে যেন বালিকার মানসনেত্রে সেই তরকারির অভয় শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। তখন আত্মহারা, পাগলিনী প্রাণভয়ে কাঁদিয়া বলিল,—"কৃষ্ণহে আমি মরিলাম, আবার রক্ষা কর, আমি নিরাশ্রয় আমায় আশ্রয় দেও"।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥

ইহাই প্রপন্নের ডাক।

হরিদাস—শরণ লইতে হইলে কি করিতে হইবে?

গুরুদেব—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শরণাগতের ছয়টী গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা

আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।

(১) শাস্ত্রোক্ত বিধিপালন, (২) নিষেধ পরিবর্জ্জন, (৩) শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিতে সমর্থ ও করিতেছেন এই দৃঢ় বিশ্বাস, (৪) শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রতিপালকত্বে বরণ করা, (৫) কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ (৬) দৈন্যোক্তি।

বৎস হরিদাস, দেখ শরণাগতের শান্তি অতুলনীয়, আনন্দ অপরিসীম। শরণাগত সাধ্বী সতী, বাক্যে বলিতেছেন "আমি তোমারই", মনে ভাবিতেছেন "আমি তোমারই", এবং দেহে ও তাঁহার শ্রীচরণতলে পড়িয়া থাকিয়া দেখাইতেছেন "আমি তোমারই"; ইহারই নাম আত্মসমর্পণ। চিরশান্তি ও পূর্ণানন্দ তাঁহার নিত্য সহচর।

হরিদাস—চমৎকার বটে, কিন্তু ইহাতে "আমাকে" একেবারে বিকাইয়া ফেলিতে হইবে, আমিত্বের গন্ধমাত্র থাকিবে না।

গুরুদেব—থাকিবে কেবল "দাস আমি", পতিসেবাই সতীর প্রাণ, তখন অন্তর্বাহ্যে সেবা লইয়াই তিনি ব্যস্ত। জগতের

প্রতিবস্তুতেই তাঁহার প্রিয়তম মিশিয়া আছেন, সুতরাং সেই সম্পর্কে সকল বস্তুই তাঁহার প্রিয়, আর সকলেরই তিনি অনুগত ভৃত্য। কাজেই সাধক তৃণাদপি সুনীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু, অথচ সকল জীবের অভীষ্টপূরণে তৎপর, নিজে দাসী সুতরাং সম্পূর্ণ অমানী অথচ সকলজীবে সম্মান করিতেছেন, আর কাতরপ্রাণে দীনভাবে কেবল প্রভুর নাম করিতেছেন, আর প্রেমবারিতে চক্ষু ভাসিয়া যাইতেছে, প্রেমে কণ্ঠরোধ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ কদম্বকেশরে পূর্ণ হইতেছে। তিনি কাঁদিতেছেন আর প্রভুচরণে জানাইতেছেন—

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধা ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

তাই প্রেমাবতার পরমদয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বরূপরামানন্দকে বলিলেন—

"এইরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়"।

এইরূপ প্রপন্ন হইয়া নাম লইতে হইবে তবেই প্রেম জন্মিবে।

নাম ও নামী অভেদ।

হরিদাস—যেরূপে নাম লইতে হইবে তাহা বেশ বুঝিলাম। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন সম্বন্ধ মূলবস্তু, এখানে বস্তুর সহিত সম্পর্ক রাহল না, কেবল তাহার নাম করিলে কি হইবে? "মেপ্পাডী"

"রেলগাড়ী" করিলে কি রেলগাড়ী আসিয়া আমাকে শ্রীপুরে লইয়া যাইবে ?

শুকদেব—এরূপে লৌকিক দৃষ্টান্ত সকল স্থলে চলে না। এস্থলে নামনামী একই বস্তু, অভেদ, যেই নাম সেই কৃষ্ণ।

দর্শনশাস্ত্রে শব্দব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। শব্দের নিত্যত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করিতেছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু আর কিছু নাই, সুতরাং নাম ব্রহ্ম। আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ভিন্ন দুই নহে, সুতরাং নামও সচ্চিদানন্দ।

নাম = শব্দ (প্রণব, গায়ত্রী, মন্ত্র) = সচ্চিদানন্দ।

নামী = কৃষ্ণ (ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্) = সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

এখন আবার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝ—নাম যে অবিনাশী সৎবস্তু তাহা পাইয়াছি। নাম আবার চিন্ময় অর্থাৎ স্বয়ং চৈতন্যরূপবিগ্রহ। নামপ্রভাবে অচেতন সচেতন ও অচল সচল হইতেছে। মহাপ্রভুর পতিতপাবন লীলায় "সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে" অদ্ভুত চিচ্ছক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে,-নাম মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

নাম = আনন্দ, নামমধ্যে প্রেমানন্দ পরিপূরিত। "নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার" অশ্রু, কম্প, নৃত্য পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক আনন্দের বিকাশ হয়।

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থসীমা॥

বৎস হরিদাস, নামের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ কর—ঐ দেখ, উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজোচিত মান, মর্য্যাদা, গাম্ভীর্য্য, মহা সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তিনি

শিশুর ন্যায় অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া পাগলের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে মহাপ্রবীণ মহাপ্রাজ্ঞ রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা রায় রামানন্দ, আর বাম-দিকে মহাদার্শনিক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বাসুদেব সার্ব্বভৌম, উভয়েই আত্মহারা, কাহারও লোকব্যবহার জ্ঞান নাই, কেবল প্রেমানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই সব গণ্যমান্য ভদ্রলোক যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, তবে কিজন্য ঐরূপ করিতেছেন? "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে" ফলদ্বারা ফলের কারণ অনু-মান করিতে হয়। মহাপ্রভু স্বয়ংই এই রহস্যের উত্তর দিয়াছেন কি শুন—

সেই কৃষ্ণ-নাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদকসম॥ শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকে এই হরিনাম-মহিমা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহাকেই মহাপ্রভু "ভাগবতের সার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

এই প্রকার ভক্তি আচরণ করাই যাহার ব্রত, সেই ভক্ত নিজ-

প্রিয় ভগবানের নামকীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেমা হইয়া প্রেমহৃদয় হন, কখন উন্মাদের ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে থাকেন, কখনও বা রাগ করেন, গান করেন, নৃত্য করেন। এখন বুঝিলে নামের মধ্যে প্রেম আছে কি না, আর নাম সচ্চিদানন্দ কি না?

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ॥

নামনামী অভেদ জানিয়াই শ্রীনামের যে কি অপূর্ব্ব শক্তি তাহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নামনামীর ভেদ না থাকায় সর্ব্বেশ্বর, মায়াগন্ধবিরহিত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চিন্তামণিবৎ অভীষ্টপ্রদ, রসময়বিগ্রহ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ, নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। "নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার" ইহাতে আর দ্বিধামাত্র নাই।

জীবোদ্ধার লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিনামের অপ্রাকৃতশক্তির বিবিধ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, গঙ্গা যমুনা বহিয়া গিয়াছে, কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কত লৌহ কাঞ্চন হইয়াছে, কত বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট নিষ্কিঞ্চন ভক্ত হইয়াছেন, কত রত্নাকর বাল্মীকি হইয়াছেন, কত পাপাচারী জগাই মাধাই মহাপবিত্র প্রেমরসময় মূর্ত্তি হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

হরিদাস—প্রভো, শাস্ত্রবিচারে ও যুক্তিতে নামনামীর অভেদ বুঝিলাম বটে, কিন্তু মন যে এখনও ঠিক্ একবস্তু বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছে না।

গুরুদেব—অনাদিকালের সংস্কার সহজে যাইবার নহে, বিশেষতঃ আমরা সবই নিজেদের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝিয়া থাকি! মায়িক জীবের দেহ জড়, স্থূল, প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর জীবের দেহী, আত্মা, চৈতন্য, কুটস্থ, প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। আবার নাম চিৎ জড়বিমিশ্র জীবের সাময়িক উপাধিমাত্র। যেমন "পদ্মলোচন অদ্য মরিয়াছে" বলিলে আমরা কি বুঝি, দেহ—মরে নাই, যেমন ছিল প্রায় তেমি আছে। দেহী - অবিনাশী আত্মা, তাহা মরিতে পারে না, তবে মরিল কে? পদ্মলোচন কাহাকে বলিব? ঐ জড়দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার তাৎকালিক ব্যবহারিক সংযোগ তাহারই নাম পদ্মলোচন। সেই অভাব হইয়াছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবিচার চলে না, সেখানে সবই একবস্তু, চিদানন্দময়।

দেহদেহিবিভাগোঽয়ংনেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

দেহদেহী নামনামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।

জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥ শ্রীচরিতামৃত।

আবার জীবের নামের সহিত জীবের স্বরূপের বিশেষ কোন ব্যুৎপত্তিগত স্বরূপসম্বন্ধ নাই। যে বালকের নাম পদ্মলোচন, কিন্তু হয়তো সে চক্ষুবিহীন বা গজচক্ষু, সুতরাং এইরূপ যৌগিক নাম দ্বারা বস্তুর পূর্ণস্বরূপ প্রকাশ পায় না। কিন্তু "কৃষ্ণ" বলিতেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে—সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইবে।

হরিদাস—কৃষ্ণ শব্দের নানা অর্থ শুনিয়াছি।

গুরুদেব—বহু অর্থ প্রকাশক হইলেও যোগরূঢ়বৃত্তি অনুসারে "কৃষ্ণ" বলিতে কেবলমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইবে। শ্রীমন্-

মহাপ্রভু বল্লভভট্টের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ইহা আরও খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন—

"প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
"শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন" এইমাত্র জানি॥"

শ্রীনামকৌমুদীতেও দেখিতে পাই—

"তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ॥"

তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ যশোদা-স্তনপানকারী পরব্রহ্ম "কৃষ্ণ শব্দ" রূঢ় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

নামনামী একই বস্তু। এরূপ নাম লইতেই পূর্ণস্বরূপের পূর্ণবিকাশ হয়। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ মাত্রে গোপবেশ নটবর শ্যামসুন্দর শ্রীনন্দদুলালের পূর্ণ ধারণা জন্মে। আবার বস্তু দর্শনমাত্রে নাম নিজেই প্রকাশ হন। শ্রীনন্দালয়ে শ্রীনন্দদুলালকে দেখিবামাত্রই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি গর্গাচার্য্য চিনিয়াছিলেন, তাই ধ্যানস্থ হইয়া সঠিক অবধারণ করতঃ বালকের নাম কৃষ্ণ রাখিলেন—

"কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়ে।"

এখন দেখ, শব্দই মূলবস্তু, আর কৃষ্ণশব্দই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র হেতু। তাই পরম দয়াল শ্রীচৈতন্যদেব এই নামরূপ মহামন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন, আর সমধিক মঙ্গলের বিষয় এই নাম সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বাবস্থায় অন্তরবাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতে জাতি ধর্ম্মের কোন বিচার নাই। ব্যোমজগতের অন্তর্ব্বাহির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই ব্যোমের গুণ শব্দ, সেই শব্দই নাম। তাই নাম সর্ব্বত্র পরি-

প্রাপ্ত হইয়া আছে, সুতরাং ইহাই উত্তম সঙ্গ, একেবারে জীবের অন্তর বাহির জুড়িয়া থাকে। সেইজন্য ইহাকেই মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনভক্তি বলিয়াছেন। আর শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে জগজ্জনকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বজন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥

তুমি হিন্দু হও বা মুসলমান হও বা খৃষ্টান হও, স্ত্রী হও বা পুরুষ হও, ধনী হও বা দরিদ্র হও, পাপী হও বা পতিত হও, যেখানে সেখানে থাক, নাম লইতে তুমি সম্পূর্ণ অধিকারী; আর নামবলে তুমি নামস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবে—যেহেতু নাম সাধ্য ও সাধন দুইই। (Means and End) নিষ্ঠাপূর্ব্বক নামাশ্রয় করিলে তোমার সর্ব্বানর্থ দূর হইবে, তুমি অচিরে শ্রীনামমূর্ত্তি শ্রীসচ্চিদানন্দস্বরূপকে লাভ করিবে।

অধিকারিভেদ।

গুরুদেব—বৎস, শ্রীকৃষ্ণভজনের পন্থা বিবিধ, সাধনও বহুবিধ। শ্রীরূপগোস্বামিপাদেরা সংক্ষেপ করিয়া চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টী সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত মূল সাধন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষাসময়ে এই নব সাধনকে পঞ্চ-সাধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আরও পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

তৎপরে ঐ পাঁচটীকে আবার তিনটীর মধ্যে পুরিয়াছেন—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন।
এই তিন হৈতে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

পুনরপি কহিতেছেন—হে সনাতন, প্রকৃত নৈষ্ঠিকতার সহিত অনুশীলন করিতে পারিলে, এক অঙ্গ সাধনেই "কৃষ্ণপ্রেমধন" মিলিতে পারে।

এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবলমাত্র শ্রীভাগবতশ্রবণে, শুকদেব নামকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদস্মরণে, লক্ষ্মী পদসেবা দ্বারা, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রুর অভিবন্দনে, হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, বলিরাজ আত্ম-নিবেদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

হরিদাস—একে আমরা বিকৃতবুদ্ধি শিক্ষিতাভিমানী অবিশ্বাসী জীব, তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব অতিজটিল, আবার সাধনের অনন্ত পন্থা,

অসংখ্য পর্য্যায়, নানা মুনির নানামত। তজ্জন্য জটিলতা ও অনাস্থা আরও বৃদ্ধি হয়।

গুরুদেব—মানুষ সব দেখিতে একরকম দেখাইলেও পরস্পরের মধ্যে ঘোর পার্থক্য আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল যত পৃথক্, মানুষেরা পরস্পর তদপেক্ষাও বিভিন্ন। জন্মান্তরীয় বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মানুসারে মানুষ প্রত্যেকেই বিভিন্ন, সকলের যোগ্যতা সমান নহে। সুতরাং ধর্ম্মানুশীলনের পন্থা ও প্রকরণ বিভিন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে—কৃষ্ণকৃপাই মূল, ঐকান্তিকী শরণাগতিই কৃষ্ণকৃপার হেতু। আবার এই আত্মসমর্পণের হেতু শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহার যেমন পাকিয়াছে, সে সাধনপথে ততদূর অগ্রসর হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্"। এই বিশ্বাসের তারতম্যানুসারেই ত্রিবিধ অধিকারভেদ হইয়াছে—যথা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

(১) যিনি সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ অথচ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তিনিই উত্তমাধিকারী। তিনি সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেন এবং ভগবানের মধ্যেও সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন। ইঁহারা কেবল জগজ্জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ফিরিতেছেন।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

(২) শাস্ত্রজ্ঞান নাই অথচ সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্; তাদৃশ ভক্তেরা শ্রীভগবানে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, চৈতন্যবিহীন মূর্খে কৃপা এবং নিজের শত্রুকে উপেক্ষা করেন।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

(৩) যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাভাব লইয়া যে ভক্ত প্রতিমাতে হরিপূজা করেন কিন্তু সর্ব্বাদরণকাণ ভক্তগুণ উদিত না হওয়াতে হরিভক্ত বা অন্যের সেবা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ তিনি কেবল ভক্তি অনুশীলন সম্প্রতি আরম্ভ করিয়াছেন, এখনও অপ্রাকৃত ভাব জন্মে নাই।

কেবলমাত্র শ্রীবিগ্রহকে ভালবাসি কিন্তু তাঁহার ভক্তের বা জীবের প্রতি লক্ষ্য নাই ইহা অতি নিন্দনীয়!

সাধনাকাশের ধ্রুবতারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর উপাসকের মধ্যে প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ এই তিনটী ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নাম মন্ত্র ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়।
এই পঞ্চরূপ হয় আশ্রয়নির্ণয়॥
প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ তন্মধ্যে হয়।
প্রবর্ত্তকের তবে হয় নাম মন্ত্রাশ্রয়॥
প্রবর্ত্তের আশ্রয় হয় শ্রীগুরুচরণ।
আলম্বন সাধুসঙ্গ জানিবা কারণ॥

উদ্দীপন হয় হরিনামসঙ্কীর্ত্তন।
এইত কহিনু কিছু প্রবর্ত্তের লক্ষণ ॥ আশ্রয়নির্ণয়।

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় প্রবর্ত্তকের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য এবং সাধুসঙ্গ, নাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে মন্ত্রাশ্রয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

দীক্ষা গ্রহণ।

—*—

গুরুদেব—পূর্ব্বে বলিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণের অন্যূন একবৎসরকাল পূর্ব্ব হইতে শিষ্যকে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিতে হইবে। শাস্ত্রে যেমন গুরুলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, শিষ্যলক্ষণও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥

দীক্ষাপ্রার্থীকে শান্ত, বিনীত, বিশুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রোপদেশগ্রহণে সমর্থ, আদেশমত কার্য্য করিতে সক্ষম, আচারনিষ্ঠ কুলীন, সুবুদ্ধিযুক্ত, সচ্চরিত্র ও যতি হইতে হইবে। প্রথমেই উক্ত সর্ব্ববিধ গুণ পূর্ণবিকসিত না থাকিতে পারে, তবে তাহার অঙ্কুর আছে কিনা জানিতে হইবে। শিষ্য প্রধানতঃ সরল, সুশীল, শ্রদ্ধা-

পরায়ণ, আত্মোন্নতিকামী, জিজ্ঞাসু ও অনলস হওয়া আবশ্যক।
শিষ্যের এই সব যোগ্যতা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল সদাচার পালন ও শ্রীনামগ্রহণ শিক্ষা দিতে হইবে। শিষ্য করা একটা ব্যবসায় নহে, ইহাতে গুরুতর দায়িত্ব জড়িত আছে।

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

যেরূপ মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, স্ত্রীর পাপ স্বামীতে পৌঁছে, সেইরূপ শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়, সেজন্য পরীক্ষা না করিয়া শিষ্য করা কদাচ উচিত নহে।

হরিদাস—দীক্ষার অর্থ কি?

গুরুদেব—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যাহার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, তত্ত্ববিদ্ ও আচার্য্যগণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন।

হরিদাস—আজকাল অনেকেই দীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন "নামই সর্ব্বমন্ত্রসার, রসনা স্পর্শমাত্রেই তাহা ফলপ্রদান করে, দীক্ষা পুরশ্চরণাদির কোনও অপেক্ষা রাখে না।"

নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ॥

গুরুদেব—শ্যামকান্ত উৎকৃষ্ট খেলোয়ার, ব্যায়ামকৌশলে ত্রিতলের ছাদ হইতে অনায়াসে অক্ষত শরীরে ভূমিতলে লাফাইতে

—করি, কিন্তু তুমি আমি পারি কই? বরং সেরূপ করিলে অকাল-মৃত্যুই আমাদের পরিণাম হয়। সেইজন্য আমাদের মত লোকের পাকাসিঁড়ীর আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত। জন্মান্তরীয় সুকৃতবলে যাঁহাদের হরিনামে ঐকান্তিকতা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই উক্তরূপ কথা বলিতে পারেন। উহার অধিকারী নিতান্ত বিরল, শাস্ত্রে বরং অন্যরূপই দেখা যায়। ব্রহ্মা, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সকলকেই দীক্ষা লইতে হইয়াছিল। লোকশিক্ষার জন্য নামনিষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরও বৃদ্ধবয়সে দীক্ষা লইয়াছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বা পার্ষদগণ যাহা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করা নিতান্ত ধৃষ্টতা।

দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন, "হে পার্ব্বতি! অদীক্ষিতের পূজার্চ্চনা, ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বৃথা হয়, এবং তিনি পশুযোনি প্রাপ্ত হন।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥

অদীক্ষিতের অন্নজল বিষ্ঠামূত্র সমান এবং তাঁহার কৃত শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃপুরুষগণ পতিত হন।

হরিদাস— শূদ্রাদি সকল জাতিই কি দীক্ষা পাইতে পারে?

গুরুদেব—উপযুক্ত হইলে অবশ্যই পারে, বরং দীক্ষিত হইলে শূদ্রও দ্বিজত্ব লাভ করে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥ তত্ত্বসাগর

যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাংস্যও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষালাভ করিলে শূদ্রও দ্বিজত্ব লাভ করে। দীক্ষাকালে ভক্ত শ্রীগুরুগোবিন্দচরণে আত্মসমর্পণ করেন।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

দীক্ষামন্ত্র পাইয়া দণ্ড হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণত শিষ্য বলেন—

যোঽয়ং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্রচ।
তৎসর্ব্বং ভবতে অদ্য চরণেষু ময়ার্পিতম্॥

পুত্রাদিই বল, আর ধনসম্পত্তিই বল, ইহলোকে বা পরলোকে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই অদ্য প্রভুচরণে অর্পিত হইল।

হরিদাস- তাহা হইলে শিষ্য আর সংসার করিবে কিরূপে?

গুরুদেব—অহংবুদ্ধিতে পারিবে না, তবে সেবকবুদ্ধিতে প্রভুর আদেশে প্রভুর সংসার করিতে পারিবে।

মন্ত্র ও দেবতা অভেদ।

—*—

হরিদাস—মন্ত্রবীজাদির স্বরূপ কি?

গুরুদেব—নাম ও নামী যেরূপ অভেদ বুঝিয়াছ, তদ্রূপ মন্ত্র ও মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাও অভেদ। কৃষ্ণমন্ত্র বা বীজ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক, তাহাতে আরও বরং বেশী কিছু বিশিষ্টতা আছে।

মন্ত্ররহস্য অতিনিগূঢ়, উহা নিতান্ত হাটে বাজারে প্রকাশযোগ্য নহে। শ্রীশঙ্কর ভগবতীকে বলিয়াছেন, মন্ত্ররহস্য অতি গোপ্য, "গোপনীয় প্রযত্নতঃ"। আরও বলিয়াছেন—

মন্ত্রাণাং দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিনী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছুভমাত্মনঃ॥

মন্ত্রের বর্ণ সকল সাক্ষাৎ দেবতা, সেই দেবতা গুরুরূপিনী, অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় শুভ ইচ্ছা করিবে, সে কখনও তাহাদের ভেদ করিবে না। মন্ত্র যথানিয়মে সেবিত হইলে অসম্ভব সম্ভব হয় এবং আশুফলপ্রদ হয়। "Will force"কে স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মন্ত্রশক্তির কতক প্রভাব বুঝিয়াছেন।

হরিদাস—বীজ কাহাকে বলে? উহার স্বরূপ কি?

গুরুদেব—উহা আরও চমৎকার, অতি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষটী যেমন ক্ষুদ্র বীজে অনুপ্রবিষ্ট; সেইরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন লীলারসান্বিত পরতত্ত্ব ঐ বীজমধ্যে অবস্থিত। স্ব স্ব গুরুস্থানে ইহার রহস্য শ্রোতব্য ও শ্রোতব্য। একজন সুরসিক ভক্ত বলিয়াছিলেন, "গুপ্ত প্রণয়ী স্বীয় প্রিয়জনের নাম অতি গোপনে সাঙ্কেতিক ভাষায় কেবল অন্তরঙ্গের নিকট বলা কহা করে। সেই নিগূঢ় প্রেমে ভাবিত নাম নায়ক নায়িকার নিকট অতি মধুর ও অতি প্রিয়। সেই নাম ধরিয়া স্থিরচিত্তে ডাকিলেই প্রিয়তম হৃদয়-মন্দিরে উদিত হন, "সেই অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করে উদয়"। বৎস, এই বীজ সেই লীলারসাশ্রিত যুগলমূর্ত্তির অতি উৎকৃষ্ট উদ্বোধক। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"ভজ নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ"।"

হরিদাস—তন্ত্রাদি নাকি পুরশ্চরণাদির অপেক্ষা করে না, কিন্তু মন্ত্রে তাহা আবশ্যক হয়।

গুরুদেব—অষ্টাদশাক্ষরীয় সিদ্ধ মন্ত্রাদিতেও পুরশ্চরণ আবশ্যক হয় না। প্রথমে তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসাধ্য, বৈরী চতুর্বিধ মন্ত্রেরই আশু ফলপ্রদায়িনীশক্তি ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি অসুরগণ মন্ত্র সাহায্যে দেবদ্বিজে পীড়ন আরম্ভ করায়, তন্ত্রকর্ত্তা শঙ্কর কীলকাদির ব্যবস্থা করিয়া সিদ্ধমন্ত্র ভিন্ন সকল মন্ত্রেরই শক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভগবৎ ইচ্ছায় মন্ত্রশক্তির খর্ব্বতা হইয়াছে।

হরিদাস—মন্ত্রসাধনে বিশেষ ফললাভ হয় না দেখিয়া মন্ত্রাদির উপর অনেকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে।

গুরুদেব—ফল হইবে কি? ঐকান্তিকতা কোথায়? সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের নিকট ত ফাঁকি চলে না। নিষ্ঠা সহকারে মন্ত্রাশ্রয় করিলে সিদ্ধিলাভ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে; দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের চিত্রটী স্মরণ কর। ঊর্দ্ধে আকাশে মৎস্যচক্র, নিম্নদেশে জলমধ্যে তাহার ছায়া, সেই ছায়া দেখিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে, আবার মধ্যপথে রাধাচক্র ফিরিতেছে। রাধাচক্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ ভেদ করিয়া মৎস্য কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই অভীষ্টবস্তু মিলিবে। দম্ভের অবতার মহাবীর কর্ণ সগর্ব্বে শরচালনা করিলেন—

গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান্ খান্॥

লজ্জিত কর্ণ লাঞ্ছিত হইলেন। কিন্তু ঐই দেখ, কৃষ্ণৈকশরণ অর্জ্জুন দীনহীন কাঙ্গালব্রাহ্মণবেশে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধনুকে শরযোজনা করিতেছেন। "শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ"

স্মরণ করিয়া করে বুদ্ধি নিবদ্ধ করতঃ পরমৈকান্তিকতা সহকারে মন্ত্রপূত করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যেমন বাণ ছাড়িলেন অমনি কৃষ্ণকৃপাবলে নিমেষে ছিন্ন মৎস্য ভূমিতলে পতিত হইল— সকলেই বিস্মিত হইলেন। কৃষ্ণা কৃষ্ণসখার অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন। সাধকেরও ঠিক এই অবস্থা। সাধুবৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শাস্ত্রমধ্যে পরতত্ত্বকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করতঃ সাধন-ধনুকে মন্ত্রশর-যোজনা করিয়া সাধক একাগ্রতার সহিত যেমন বিষ্ণুমায়ারূপ চক্রভেদ করিবেন, অমনি নিমেষে কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে ও অভীষ্ট বস্তু মিলিবে।

হরিদাস—মন্ত্রার্থ না বুঝিয়া কেবল কং রং লং করিলে কি কোন ফললাভ হয়?

গুরুদেব—মন্ত্রার্থ জানাই উত্তম, তাহাতে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তবে না জানিয়া অমৃত ভোজন করিলেও যেমন সুফল হয়, তদ্রূপ "মন্ত্রোয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি"। রসনাস্পর্শমাত্রেই মন্ত্র ফল প্রদান করে। মন্ত্র যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপকে প্রদান করে, তেমনই কাম্যমন্ত্রের দ্বারা কাম্যকর্মও সিদ্ধ হয়।

সাধনভক্তি।

হরিদাস—প্রভো, ভক্তি কাহাকে বলে কীর্তন করুন।

গুরুদেব—বিবিধ শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ দেখা যায়। এক্ষণে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেশ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নাম ভক্তি। কিন্তু সেই সেবা কৃষ্ণের প্রীতিকর এবং আবরণাদি পরিশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নির্ম্মল হওয়া চাই। আমি ও কৃষ্ণ একবস্তু, এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান মধ্যে সেব্য সেবক সম্বন্ধ না থাকায়, জ্ঞানযোগে শুদ্ধাভক্তির স্থান নাই। আবার যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মে কামনা থাকে বলিয়া ও ঐশ্বর্য্যভাব প্রচুর থাকায় কর্ম্মযোগেও শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়না।

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।"

তাই ভক্তিতে, ভুক্তি, মুক্তিবাঞ্ছার, লেশমাত্র থাকিবে না, সম্পূর্ণ অহৈতুকী হইতে হইবে। দার্শনিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী এবিষয়ে বহুবিচার করিয়াছেন, এবং ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী নিজকৃত শ্লোকে ইহা বেশ স্ফুটতর করিয়াছেন।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(ভক্তিরসামৃত)।

অনুশীলন=সর্ব্বপ্রকার কায়িক বাচিক মানসিক ক্রিয়া। এই অনুশীলন অনুকূল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর হওয়া চাই। শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া অনুকূল না হওয়ায় ভক্তিবাচ্য নহে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও কাম্যকর্ম্মাদি দ্বারা অজ্ঞানতা ও কামনার আবরণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং ভক্তি সর্ব্বথা জ্ঞানকর্ম্মের সম্বন্ধশূন্য। কৃষ্ণপ্রীতি-কামনা ভিন্ন অন্য কোন কামনা ভক্তিতে থাকিবে না। এইরূপ অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে।

হরিদাস—সেরূপ অহৈতুকী ভক্তির উদয় হওয়া সুদুষ্কর;

গুরুদেব—সুদুষ্কর বলিয়াই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত অনুশীলন করা আবশ্যক। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি, নিত্যবস্তু। সর্ব্বজীবেই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, অনুশীলন দ্বারা আবরণ বিমুক্ত করিয়া প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। এই উত্তমা ভক্তি ত্রিবিধ—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা॥

সাধনভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, এবং চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া প্রেমভক্তির উদয় করে। সাধন-ভক্তির আবার দুইটী বিভাগ—বৈধী ও রাগানুগা।

ভালবাসাই মূলবস্তু; ইষ্টদেবে যখন এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে যে, বঁধুকে না দেখিয়া থাকা যায় না এবং তৎসেবাজনিত দুঃখকেও সুখ মনে হয়, তখন সেই প্রীতিকে "রাগ" বলে। শ্রীকৃষ্ণে যখন এই রাগের উদয় হয় নাই, সাধক কেবল শাস্ত্রশাসন ভয়ে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেন তখন সেই ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। কিন্তু বিধি অনুসারে ঐরূপ অনুশীলন করিতে করিতে রাগের উদয় হয়, তজ্জন্য সাধারণ সাধকের বৈধীভক্তির আশ্রয় লওয়াই শাস্ত্র ও সাধুজনসম্মত। স্বয়ং মহাপ্রভু সাধনভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥

হে সনাতন, কৃষ্ণকৃপায় জীবের প্রথমে সাধুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা

জাইলে, তখনই জীবকে সাধুসঙ্গাশ্রয় করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৈধী-ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তাহা হইতে ক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি জন্মিবে। এই আসক্তি হইতে ভাবের অঙ্কুরোদয় হইবে, সেই ভাব ঘনীভূত হইলে পরমপুরুষার্থ প্রেমলাভ হইবে। এই প্রেম আবার ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে সপ্তস্বর্গে উঠিবে। প্রেম হইতে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব জন্মিবে। মহাভাবই প্রেমের চরম সার জানিবে।

আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এই রাগভক্তি, সেই লোভে অনেকে শাস্ত্রবিধি না মানিয়া একেবারে উৎকৃষ্ট অনুরাগী হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সেরূপ অনুরাগ উৎপাতের কারণ হয়। গোস্বামিরা ইহা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

হঠাৎ একটা কৃষ্ণ শিশু হইবার ইচ্ছা অনেকের হয়, তাই একেবারে শুদ্ধপ্রেমের অধিকারী ব্রজবাসী হইয়া বসেন; বৎস, কদাচ সেরূপ ভ্রান্ত হইওনা। স্বয়ং মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত, শ্রীগোস্বামি-পাদগণের নির্দ্দিষ্ট, মহাজনসেবিত বাঁধাসিঁড়ী দিয়া উঠিবার চেষ্টা কর। আমাদের ভরসা সেই কৃষ্ণকৃপা—সরলপ্রাণে কায়মনে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থ চেষ্টা করিতে থাকিলে, অবশ্যই সেই পতিতোদ্ধারণ পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের করুণা হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই বারংবার বলিয়াছেন—

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।

কর আত্মনিবেদন দেহ গেহ পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব রতি মতি তাঁরে সেব
প্রেমকল্পতরু বরদাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন রাধিকার প্রাণধন
অপরূপ এই সব কথা ॥

হরিদাস—পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম বৈষ্ণব হওয়া অতি সহজ কিন্তু এখন দেখিতেছি অতি সুকঠিন।

গুরুদেব—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নহে, ষড়বিংশতি গুণের সমাবেশ হওয়া চাই। তজ্জন্য রীতিমত অনুশীলন করা আবশ্যক।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

শ্রীচরিতামৃত।

হরিদাস—প্রভো, আর বেশী বিচার শুনিতে চাহি না, একেবারে সব ধারণা ঠিক রাখিতেও পারিব না; এখন আমার কর্ত্তব্যোপদেশ করুন।

গুরুদেব- ঠিক্ কথা, চিরদিন কেবল বিচার করিতে থাকিলে কাজ করিবে কখন্? বেশী বিচারও অনাবশ্যক, মোটামুটি একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়, তখন তিনিই সহায় হন। ছেলেরা পল্লীগ্রাম থেকে কলিকাতায় গেলে প্রথমে কিছুদিন কোন্ কলেজে ভাল পড়া হয়, তাই যাচাই করিয়া বেড়ায়; শেষে পছন্দমত যেমন একটাতে ভর্ত্তি হয় অমনি মন স্থির ও শিক্ষারম্ভ। শিক্ষকেরাও সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই রূপ সাধক—

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে তাঁকে পায়॥

শ্রীচরিতামৃত।

কতিপয় বিধি ও নিষেধ।

—*—

শ্রীগুরুদেব—১। জীব কৃষ্ণদাস, সর্ব্বদা জীবকে স্বকীয়স্বরূপ বজায় রাখিতে হইবে। জন্মান্তরীয় কর্ম্মবন্ধন শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে।

২। পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিবে এবং অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে ভাগবতীয় কথায় ও অনুকূল ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠে মনকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রথমে জোর করিয়া মনকে শ্রবণ-

কীর্ত্তনে লাগাইবে, একটু পরে অমৃতে আপনিই মজিয়া থাকিবে।

৩। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণোন্মুখী করিতে হইবে, তাহা হইলে মন অসৎসঙ্গের সুযোগ পাইবে না।

৪। "আনন্দ" আত্মার স্বরূপ, তাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব"। সর্ব্বকার্য্যে সন্তোষ রক্ষা করিবে। দেহ, গেহ, পুত্রকলত্রাদি অনিত্যবিষয়ে আসক্তিশূন্য থাকিবে, কেবল সেবাবুদ্ধিতে বাহ্য মমতার সহিত কর্ত্তব্য করিবে। "অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার" মহাপ্রভুর আদেশ। অভাব হইতে অসন্তোষের সৃষ্টি, দেখিও যেন কোন অভাব তোমাকে ক্লেশ দিতে না পারে। সুখ চাই দুঃখ চাইনা, বলিলে চলিবে না; সুখে দুঃখে স্তুতি নিন্দায় অটল থাকিবে।

৫। ভক্ত-ভগবানের সঙ্গই সুখ, তদিতর দুঃখ।

৬। নিজে শান্ত ও বিশুদ্ধসত্ত্ব না হইলে, শ্রীভগবান্‌কে পাইবার আশা বৃথা, সুতরাং অন্তর্বাহ্যে পবিত্র হও। বিষ্ঠামূত্র যেমন বহির্জগতের অশুচি, কুটিলতা ও জটিলতা তদ্রূপ অন্তর্জগতের অশুচি। শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় সরল বালকচরিত্র হইতে হইবে। ভিতরে বাহিরে, মনে মুখে এক হইবে। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভণ্ড হইও না। ভণ্ডের মুক্তি নাই। কুৎসিত আমোদ বা অনাবশ্যক বহিরঙ্গ বিষয়ে মিশিবে না।

৭। "গ্রাম্যকথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে"; তাহাই হিংসা দ্বেষ ও নিন্দার জন্মস্থান, সেস্থান হইতে দূরে থাকিবে।

৮। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করাই বিধি, শক্তি না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, বৈষ্ণবধর্ম্ম কান্নাকাটির ধর্ম্ম হইলেও, কাঁদিতেও শক্তি

যায়। গৃহী হইতে হইলে অনাসক্তির তৈলে পাঁকালমাছ হইয়া পরিণতবয়সে সংসার কর্দ্দমে নামিবে, তখন আর দাগ লাগিবেনা।

৯। সুস্থশরীর না হইলে ভজন হয় না বরং বিঘ্ন জন্মে। সাত্ত্বিক আহার ধর্ম্মজীবনের সহায়। হবিষ্য বস্তু পবিত্র, সুপাচ্য ও বলকারক। দিবসে মিতাহার ও রাত্রিতে লঘু আহার কর্ত্তব্য।

১০। শ্রীএকাদশীতিথিতে অন্নগ্রহণ করিবে না, তবে ফল-মূলাদি গ্রহণের বিধি আছে। কেবল লঙ্ঘন দিলে ফল হয়না, সঙ্কল্প করিয়া হরিকথায় দিন কাটাইতে হয়, ইহা ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়তা করে। পক্ষান্তে একদিন অনাহার ডাক্তারদেরও অভিমত বটে।

১১। কায়মনোবাক্যে সত্যরক্ষা করিবে।

১২। কুসঙ্গ ও কুৎসিতবিষয় হইতে দূরে থাকিবে। নচেৎ পূতিগন্ধ সংক্রামিত হইয়া রোগী হইবে। পাপ ঘৃণার্হ, পাপী দয়ার্হ।

১৩। "কামিনীকাঞ্চন"সর্ব্বানর্থের মূল তাই বলিয়া স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিও না, অপিচ জগন্মাতা ভবতারিণীর প্রতিকৃতি জানিয়া, মাতৃসম জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোকের সহিত বৃথা বাক্যালাপ করিও না। যুবতী স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ একাকিনী থাকিলে তথায় যাইবে না। মহাপ্রভুর নিষেধ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

"কাষ্ঠের প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

১৪। বিলাসিতাকে আদৌ প্রশ্রয় দিবে না, উহাতে ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসাবৃদ্ধি হয় এবং সংসারযাত্রানির্ব্বাহ দুষ্কর হয়।

১৫। উদ্দামবয়সে মনকে সাধুসঙ্গে বা সৎপুস্তকাদিপাঠে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে। রাত্রিতেও চরিত্রবান্ গুরুজনের সহিত শয়ন কর্ত্তব্য। নির্জ্জনে বেশী সময় না থাকাই শ্রেয়ঃ। চিত্তচাঞ্চল্যের সূচনা বুঝিলেই সাধুগুরুজনের সঙ্গে আসিবে। শয়ন বা

পাঁঠগৃহে ধর্ম্মবীরগণের চিত্র রাখিবে। সর্ব্বদা অন্তর বাহিরে পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

১৬। নাভির নিম্নভাগ শাস্ত্রমতে অশুচি সুতরাং অনর্থক স্পর্শ করিবে না। অতিকোমল শয্যায় শয়ন করিবে না।

১৭। শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লইয়া তদীয় মধুর লীলাগ্রন্থাদি পাঠ করিবে, ও সঙ্কল্প করিয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শ্রীনাম জপ করিবে, নিশ্চয়ই চিত্ত নির্ম্মল হইবে। কেবল মুখে জ্ঞানী হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। কখনই নিজেকে "রিপুজয়ী" বলিয়া মনে করিও না,—চিতায় ছাই না উড়িলে সতীর সতীপণা রক্ষিত হইল বলা যায়না। যাহার নিকট মহাভক্ত শিব লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহার সহিত দুর্ব্বল জীব কি যুঝিবে? কচ্ছ বৈষ্ণবোচিত মিনতির ভাবে থাকাই উত্তম।

১৮। ক্রোধ চণ্ডাল, তাহাকে স্পর্শ করিতে দিওনা। ক্রোধের কারণ হইলে সেস্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিবে।

১৯। লোভী ব্যক্তি অপরিণামদর্শী, পরিণাম অনুশোচনা। মহাপ্রভুর আদেশ—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে"।

২০। মোহ কত ছলে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে, বিবেকবুদ্ধি সহকারে নিত্যানিত্য বিচার করিয়া চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ রাখিবে।

২১। মদগর্ব্বিত যুবক আত্মবঞ্চিত। চাকরের মাথা আবার উঁচু হইবে কিজন্য? সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে সম্মান করিবে ও নিজে অমানী হইবে।

২২। মৎসরতা যাহাকে কলুষিত করিয়াছে, সে পরকে আপন করিতে পারিবে না, প্রেমময় শ্রীচৈতন্যদেবকে সে কিরূপে পাইবে?

২৩। নিদ্রা ও অলসতা আয়ু হরণ করে। বালকের ৬ঘণ্টা,

যুবকের ৫ ঘণ্টা এবং সাধকের ৪ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট।

২৪। প্রত্যেক কার্য্যে শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে এবং সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তিনি অবশ্যই শরণাগতকে আশ্রয় দিবেন এইরূপ আশাবদ্ধ হইবে।

২৫। কদাচ যেন সঙ্কল্পচ্যুতি না হয়। সেরূপ হইলে অনুতপ্তহৃদয়ে নাম করিবে এবং কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মনন করিবে। এজন্য কেহ কেহ স্মরণপুস্তিকা রাখেন। কোন নৈতিক যুবক একই অপরাধ তিনবার হওয়ায়, কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্তদ্বারা বড় অক্ষরে অপরাধটী লিখিয়া রাখেন, তদবধি সেই দোষ সংশোধিত হইয়া যায়।

২৬। ত্রিসন্ধ্যাসময়ে দৈনিক কার্য্যের নিকাশ হয়, ইহা উত্তম।

২৭। ভক্তিসহকারে সাধুসজ্জনের সেবা করিবে। ভক্তের কৃপা প্রসাদের ও শ্রীচরণধূলির অদ্ভুতশক্তি।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ তিন ধরে মহাবল॥ শ্রীচরিতামৃত।

২৮। অসাধুর অন্ন গ্রহণীয় নহে, উহাতে মন মলিন হইবে।

২৯। সর্ব্বজীবে দয়া ও পীড়িতের সেবা করিবে। জীবহিংসা আদৌ করিবে না এবং কাহাকে উদ্বেগ দিবে না।

৩০। শ্রীহরিনামগ্রহণের কালাপেক্ষা নাই, সুযোগ্য লোক না পাইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া অনেকে নিজেই সঙ্কল্পপূর্ব্বক সিদ্ধনাম গ্রহণ করেন। ভজনে পরাপেক্ষা নাই।

৩১। নিজমত-স্থাপনের জন্য শুষ্ক তর্ক করিও না, ভগবদ্‌-ব্যাপার সম্বন্ধীয় অখিলচেষ্টা "শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু" করিও। নচেৎ ভক্তাভিমান ও প্রতিষ্ঠা আসিয়া সর্ব্বনাশ করিবে।

৩২। নির্জ্জন কুটীর, নদীতীর ও উপবন ভজনের অনুকূলস্থান।

৩৩। শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র বা ভক্তের শ্রীপাট ইত্যাদি তীর্থস্থলে যাওয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে সাধুসঙ্গ ও ভক্তির উদ্দীপনা হয়।

৩৪। এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিও না, সুকর্ম্মে অধিককাল ক্ষেপণের চেষ্টা করিবে। সাংসারিক-আবশ্যককর্ম্ম অনাসক্ত-ভাবে করিবে, কদাচ কুকর্ম্ম করিবে না, সেইখানেই আত্মহত্যা।

নিত্যকর্ম্মপ্রণালী।

যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, যথারীতি ধর্ম্মসাধনে জীবন গঠিত করিতে পারিবেন তাঁহাদিগের শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধিনিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংসারাবদ্ধ, গৃহকর্ম্মে বিব্রত কেবল তাঁহাদিগের অনুশীলন জন্য কয়েকটী কর্ত্তব্য লিখিত হইল।

১। রাত্রি ৫ ভাগে বিভক্ত। পঞ্চম ভাগকে "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" বলে। তাহাই ভজনের অনুকূল সময়। সঙ্কল্প করিয়া চেষ্টা করিলে ঠিক্ ঐসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবার অভ্যাস হইবে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে "শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ" স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে। এই সময়ে প্রভাতীসুরে গৌরকীর্ত্তন অতিমধুর।

২। শৌচাদি ও দন্তধাবন সমাধান্তে পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রীতুলসীসেবা করিয়া, করতাল বাদ্য বা ঘণ্টাধ্বনি করতঃ বিষ্ণুমন্দিরে বা পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে। পূজাগৃহ মার্জ্জন, নির্ম্মাল্য অপসারণ করত চুয়াচন্দন ও ধূপধুনাদি দিবে।

৩। অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা ?
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

এই মন্ত্রদ্বারা 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিয়া পূতদেহে শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ করণান্তে নিজ ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। কেহ কেহ এই সময় আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ইত্যাদিও করেন। ধ্যানান্তে মঙ্গল আরাত্রিকাদি সমাপন করিয়া স্তোত্রপাঠ ও মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে পূতসলিলে প্রাতঃস্নান করিবে। অসুস্থ হইলে আর্দ্রবস্ত্রদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনা করিবার ব্যবস্থা আছে। তদনন্তর তর্পণাদি সমাধা করিয়া বৈষ্ণবোচিত চিহ্নাদি ধারণান্তে (১)গুরু-ধ্যান ও গুরুপূজা এবং ইষ্টদেবের ধ্যান ও পূজা করিবে। শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, গুরুস্তব, শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক পাঠ করিবে। স্থিরচিত্তে সঙ্খ্যাপূর্ব্বক শ্রীনাম জপ করিতে হইবে।

তদনন্তর ভক্তিসহকারে (২)প্রার্থনা শ্লোক পাঠ করিবে,।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

এবং (৩)গুরুপ্রণাম (৪)গৌরাঙ্গপ্রণাম (৫)শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম (৬)পিতা-মাতাকে প্রণাম এবং বৈষ্ণব প্রণাম করিবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

তৎপরে বিজ্ঞপ্তি শ্লোক ও অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কি ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

---

(১) ৩২ ও ৩৫ পৃঃ। (২) ১২ পৃঃ। (৩) ২১ পৃষ্ঠার নিম্নে। (৪) ৫৭ ও ৪৬ পৃঃ। (৫) ৪ পৃঃ ও (৬) ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণে(৭) সমর্পণ শ্লোক পাঠ করিবে। তৎপরে শ্রীতুলসী স্নান ও প্রণাম করিবে। অবশেষে অনুজ্ঞা শ্লোক পাঠ করিয়া সেবাবুদ্ধিতে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

ত্রৈলোক্যচৈতন্য ময়াধিদেব
শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

যথাসময়ে যথানিয়মে ইষ্টদেবকে সাত্ত্বিক বস্তু ভোগ দিয়া প্রণাম করতঃ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

কার্য্যাবসানে শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণলীলাগ্রন্থাদি পাঠ করিবে, সায়ংকালে ইষ্টদেবকে গন্ধমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনা আরাত্রিকাদি করিবে ও সজাতীয় ভক্তসঙ্গে প্রাচীনপদ বা শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের পদাবলী ভক্তিপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিবে। রাত্রিতে শীতলী-প্রসাদ পাইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিবে ও ভগবৎচিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে।

যাঁহারা দীক্ষিত নহেন তাঁহাদের পূজাদি করিবার আবশ্যক নাই। নিষ্ঠাসহকারে নামজপ ও ইষ্টধ্যান, ইষ্টচিন্তা, স্তবপাঠ, লীলাগ্রন্থ অধ্যয়ন ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠেয়। ফলকথা "কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা ক্ষণ নাহি যায়।" এই বিধি যতদূর পার প্রতি-পালন করিবে।

(৭) ১৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ঐকান্তিকতা।

—•—

হরিদাস—(শ্রীগুরুচরণে পতিত হইয়া) প্রভো, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই উপদেশমত জীবন গঠন করিতে পারি।

গুরুদেব—বৎস, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র ঐকান্তিকতা। নাছোড় হইয়া লাগিলে এই দুর্ব্বলমানব কৃষ্ণকৃপাবলে অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে। নিজেকে অজর ও অমর ভাবিয়া বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জন করাই শাস্ত্রবিধি। সেস্থলে পরাবিদ্যা ও পরমার্থলাভ করিতে কিরূপ অদম্য অধ্যবসায় প্রয়োজন তাহা একবার বুঝিয়া দেখ। তুমি নিষ্কাম হও বা সকাম হও অথবা মোক্ষকামী হও তাহাতে বেশী কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না, কিন্তু তোমাকে উদারচেতা হইয়া সুতীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরম-পুরুষকে ভজনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বৎস "নরদেহ ভজনের মূল"। সেই অতিদুর্লভ মানবজনম পাইয়াছি, মহাভাগ্যে ভারতে বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলে স্থান পাইয়াছি গোস্বামিগণের অনন্তজ্ঞানভাণ্ডার পাইয়াছি, স্বয়ং প্রেমাবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে গুরু পাইয়াছি, এমন মহাসুযোগ কিছুতেই আমরা ব্যর্থ করিতে পারি না। শ্রীবৃন্দাবনবাসী নিষ্কিঞ্চন ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দদাস যথার্থই বলিয়াছেন, "ভাই সুদৃঢ়ব্রত হও,

দুই বৎসরেই হউক বা দুই যুগে হউক, এই জন্মে হউক বা শতজন্মে হউক, সহজে হউক বা কঠোরতায় হউক, কৃষ্ণপ্রেমধন পাইতেই হইবে। দুস্তর সাগর দেখিয়া ভয় করিও না, "জয় রাধাগোবিন্দ" বলিয়া ঝম্প প্রদান কর, দেখিবে কৃষ্ণকৃপায় সমস্তই সুকর হইবে। বৎস নিশ্চিত জানিও যে সাধুসঙ্কল্পের সহায় স্বয়ং শ্রীহরি। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ প্রভু একবার করিবেন অঙ্গীকার"
জেন মোর এ সত্যবচন।

ভক্তবাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে।

হরিদাস—জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক কাতরকণ্ঠে গাহিলেন— বাগেশ্রী—যৎ।

গৌর, আর কতদিন্ কাঁদ্‌বো ব'সে ভবাব্ধি কূলে।
আমায় দয়া কর হে গৌরহরি তরাও অকূলে॥
কল্পতরু তুমি হ'লে আচণ্ডালে প্রেম দিলে।
আমার বেলায় কৃপণ হ'লে বদন ফিরালে॥
দীনহীন হরিদাসে রেখ গৌর চরণপাশে।
নাছোড় হ'য়ে রইলাম প'ড়ে চরণ যুগলে॥

বৎস, কৃষ্ণকথার অন্ত নাই, ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

পক্ষী যৈছে আকাশের শেষ নাহি পায়।
যতদূর শক্তি তার তত উড়ি যায়॥

আমরা সেইরূপ অনন্ত মহাসমুদ্রের এক কণিকা স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম।

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতং॥

জয় জয় রাধারাণী জয়নন্দলালা।
শ্যামসুন্দর জয় জয়ব্রজবালা॥

হে হৃদয়দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, তোমার মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হউক জগজ্জীবে তোমার করুণামৃত বর্ষিত হউক।

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

হে অদোষদর্শী ভক্তবৃন্দ, অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণসরোজ-মধুপানে অধমকে কৃতার্থ কর।

না করিহ কেহ রোষ না লইও কেহ দোষ
প্রণমহু ভক্তের চরণে।

শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু।